স্বস্তিকা

৬৫ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা।। ১৯ নভেম্বর - ২০১২।। ৩ অগ্রহায়ণ - ১৪১৯ ।। দাম : সাত টাকা

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৮

বাংলাদেশে হিন্দুরা অত্যাচারিত জেনেও ভারত
কোনও প্রতিবাদ করেনি □ ৯

পশ্চিমবঙ্গ কি আবার ভাগ হবে? □ ১০

শুধু লোবাগ্রাম নয়, সারা রাজ্যেই পুলিশ প্রশাসন ব্যর্থ □ ১১

দুর্নীতির উৎস সন্ধানে : আম-আদমি বছরে ৪ লক্ষ কোটি টাকা
ঘুষ দেয় নেতাদের □ তারক সাহা □ ১২

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজা □ উজ্জ্বলকুমার মণ্ডল □ ১৪

জগদ্ধাত্রী পুজোর নিয়ম-কানুন □ নবকুমার ভট্টাচার্য □ ১৭

বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী ও চীনা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে
প্রস্তাব আর এস এসের □ ১৮

দলপতিপুরের মন্দির □ ডঃ প্রণব রায় □ ২২

বামাচারী তান্ত্রিক □ নবকুমার ভট্টাচার্য □ ২৩

মৃত্যুঞ্জয়ী শৃঙ্গজয়ী এক মহিলার কথা □ মিতা রায় □ ২৬

দড়ি ধরে মারো টান □ সঞ্জীব বাগচী □ ২৭

জন্মেই মৃত্যুর লক্ষণ □ জি পার্থসারথি □ ২৮

'সেই সময়' ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় □ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৩০

ভাতুয়ার ছেলে □ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় □ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১১ □ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ □ অন্যরকম : ৩৩ □ □ রঙ্গম : ৩৫ □
পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৬-৩৭ □ □ শব্দরূপ : ৩৮ □ □ চিত্রকথা : ৩৯

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো
পৃঃ ১৪-১৭

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৫ বর্ষ ১৩ সংখ্যা, ৩ অগ্রহায়ণ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
যুগাব্দ - ৫১১৪, ১৯ নভেম্বর - ২০১২

দাম : ৭ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩২৫ টাকা।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার বিশেষ বিষয় :

উত্তরাধিকারহীন গান্ধী

তিনি ভারতবর্ষের এক প্রধানমন্ত্রীর জামাই, এক প্রধানমন্ত্রীর স্বামী, এমনকী এক প্রধানমন্ত্রীর পিতাও। অথচ কী আশ্চর্য দেখুন, স্বল্পায়ু এই মানুষটি, ক্ষমতার কেন্দ্রে যাঁর নিত্য ওঠাবসা, তিনি কেমন স্বচ্ছন্দে চলে গিয়েছেন পর্দার অন্তরালে! মানুষটির নাম বলাই বাহুল্য ফিরোজ গান্ধী। যাঁর শ্বশুর জওহরলাল নেহরু, স্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং পুত্র রাজীব গান্ধী। এঁর গান্ধী পদবী নকল, এমনই অভিযোগে তোলপাড় হওয়া ছাড়া ফিরোজ চলে গেলেন বিস্মৃতির আড়ালে, এমনকী জন্মশতবর্ষ পালনের হুজুগের মধ্যেও। কিন্তু কেন? এর পেছনে কি লুকিয়ে রয়েছে কোনও অপ্রিয় সত্য? ফিরোজ গান্ধীর জন্মশতবর্ষে স্বস্তিকার অনুসন্ধান। লিখেছেন— সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

।। দাম একই থাকছে — সাত টাকা।।

HB ®

INDIA'S NO. 1 IN ISI MARKED HEAVY PIPE FITTINGS

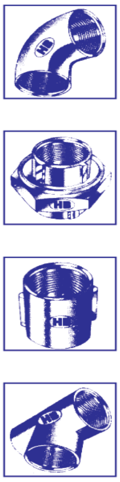

HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES

54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
15, College Street, Kol-12
Ph : 2241 7149 / 8174

Sister Concern

Partha Sarathi Ceramics

4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

কংগ্রেসের ধর্ম

হরিয়ানার সুরজকুঞ্জে কংগ্রেসের সভানেত্রী বলিয়াছেন, 'বিগত আট বছরে আমরা অনেক কিছু করিয়াছি যাহাতে সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়। এইটি আমাদের কর্তব্য। এই কর্তব্যটাই হইতেছে আমাদের ধর্ম।' বিগত আট বছরে জনসাধারণ অর্থাৎ আম-আদমির জন্য কংগ্রেস কি কি করিয়াছে তাহা আজ জনসাধারণ হাড়ে হাড়ে টের পাইতেছেন। আট বছর ধরিয়া আমআদমির জন্য কর্তব্য করিবার নামে লুণ্ঠন চালাইতেছে কংগ্রেস। দলের সভানেত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রধানমন্ত্রীসহ প্রায় প্রত্যেক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে লুণ্ঠন দুর্নীতির অভিযোগ উঠিয়াছে। সভানেত্রীর জামাইবাবাজীবনও এই লুঠেরার অভিযোগ হইতে মুক্ত নয়। কয়েকজন মন্ত্রীর স্থান হইয়াছে জেলের কয়েদখানায়। দুর্নীতির কলঙ্ক হইতে দৃষ্টি আড়াল করিতে আজ আর্থিক সংস্কারের নামে আম-আদমির জন্য উন্নয়নের কর্তব্য পালন করিবার অছিলায় পুনরায় লুঠ করিবার আয়োজন চলিতেছে। আট বছর ধরিয়া ছোট বড় মিলাইয়া কতগুলি কেলেঙ্কারি ঘটিয়াছে এই সরকারের আমলে তাহার হিসাব মনে রাখা কষ্টকর। আজ এই কেলেঙ্কারি প্রকাশ হইয়াছে তো পরের দিন অন্য কেলেঙ্কারি প্রকাশ হইতেছে। নিত্যনতুন কংগ্রেসী মন্ত্রী সাংসদ বিধায়ক নেতাদের কুকীর্তি প্রকাশিত হইতেছে। সংখ্যাতত্ত্ব গবেষকেরা, রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলিতেছেন বিগত পাঁচ বছরেই কেবল শতাধিক দুর্নীতিতে ফাঁসিয়াছেন কংগ্রেসের কোনও-না-কোনও নেতা। আন্না হাজারে, বাবা রামদেব সহ অনেকেই যখন দুর্নীতিকে রোধ করিবার বিরুদ্ধে কঠোর লোকপাল আইন করিবার জন্য সরকারের নিকট দাবি জানাইতেছেন তখন এই সরকার নানা কারণে তাহার বিরুদ্ধতা করিতেছে। কঠোর আইন হইলে যে কংগ্রেসীদের লুঠ প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আসলে এই সরকার এবং তাহার দল দুর্নীতিগ্রস্ত লুঠেরাদের হাতে বিক্রি হইয়া গিয়াছে। কেজরিওয়াল ঠিকই বলিয়াছেন যে এই সরকার গণতন্ত্রকে বেচিয়া দিয়াছেন। মনমোহন সিং নিজেও বিক্রি হইয়া গিয়াছেন। তাই এই সরকার দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সব চাইতে বড় বিপদ। বস্তুত এই সরকার সর্বক্ষেত্রেই অসৎ, অসাধুদের সরকার। কালো টাকা লইয়া শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি তুলিয়াছিল বিজেপি সহ সমস্ত রাজনৈতিক দল। সরকার তাহা প্রকাশ করেন নাই নিজেদের সততার মুখোশ খুলিয়া যাইবার ভয়ে। আজ কালিরামের ঢোল ফাঁসিয়া গিয়াছে। বিদেশী ব্যাঙ্কে গচ্ছিত কালো টাকার কালো মালিকদের পরিচয়ও ধীরে ধীরে জনসমক্ষে আসিতেছে। আরও জানা যাইতেছে এই বিশাল পরিমাণ কালো টাকা দেশে ফিরিয়ে আনিবার কোনও সদিচ্ছা এই সরকারের পূর্বেও ছিল না, এখনও নাই। বরঞ্চ কালো টাকার কালো কারবারী ব্যক্তিদের রক্ষা করিবার দায়িত্ব লইয়াছে এই সরকার। আজকের মহামান্য রাষ্ট্রপতি নাকি অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন এই কালো টাকার কারবারীদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাহাও অভিযোগ উঠিতেছে। ইহা গণতন্ত্রের লজ্জা। সাম্প্রতিক সময়ে ক্যাগ রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে একাধিক দুর্নীতি সামনে আসিয়াছে এবং তাহা লইয়া তোলপাড় হইয়াছে জাতীয় রাজনীতি। কংগ্রেসী কেচ্ছা প্রকাশ হইতেছে বলিয়া সরকার ক্যাগকে তিন সদস্যের একটি সংস্থা বানাইতে চলিতেছে। সরকারের বিভিন্ন দুর্নীতি ক্যাগ ফাঁস করিতেছে বলিয়া এই রকম ব্যবস্থা করিতে চলিতেছে কেন্দ্র। এই সরকারের ধর্মই হইল দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষকতা। কংগ্রেসের এক সাংসদ আত্মসমালোচনার সুরে তাই প্রকাশ্যেই বলিয়াছেন, কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা ভোগ বিলাসেই ব্যস্ত। ঠাণ্ডা ঘরের বাহিরে যে একটা জীবন রহিয়াছে তাহা তাঁহাদের জানা নেই। অন্যদিকে আর এস এস-এর নেতা কর্মীরা যথেষ্ট কর্মঠ এবং কর্তব্যপরায়ণ। আর্থিক সংস্কারের নামে আম-আদমিকে শোষণ করিতে এই সরকার যে পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা প্রকৃত বিপদের কারণ। পাটের ব্যবহার কমানোর সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত লইয়াছেন কেন্দ্রীয় সরকার। বিশেষজ্ঞরা বলিয়াছেন প্ল্যাস্টিকের বস্তার তুলনায় চটের বস্তা অনেক বেশি পুনর্ব্যবহারযোগ্য এবং পরিবেশ দূষণ ও খাদ্যে বিক্রিয়া প্রতিরোধ করিতে হইলে চটের বস্তা প্রয়োজন। ১৯৮৭ সালে রাজীব গান্ধী সরকার কেন্দ্রীয় আইন করিয়াছিলেন জুট প্যাকেজিং মেটিরিয়াল অ্যাক্ট অনুযায়ী চাল গম চিনির প্যাকেজিং চটের ব্যাগে করিতে হইবে। সেই আইনকে পঙ্গু করিয়া আজ কিছু বিদেশি সংস্থাকে সুবিধা দিতে চটের বস্তার ব্যবহার কমাইতে তৎপর কেন্দ্র। কেন্দ্রের এই পদক্ষেপে তিন কোটি চটকলকর্মীর রুটি রুজি বন্ধ হইবে। এই মানুষ-মারা পদক্ষেপকেই সংস্কার বলে। ইহাই কংগ্রেসের ধর্ম।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

জগৎটা আমার জন্য, আমি কখনও জগতের জন্য নই। ভালমন্দ আমাদের দাস-স্বরূপ, আমরা কখনও তাদের দাস নই। পশুর স্বভাব—উন্নতি করা নয়, বরং যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায় পড়ে থাকা; মানুষের স্বভাব—মন্দ ত্যাগ ক'রে ভালটা পাবার চেষ্টা করা। আর দেবতার স্বভাব—ভাল-মন্দ কিছুর জন্য চেষ্টা থাকবে না, সর্বদা সর্বাবস্থায় আনন্দময় হয়ে থাকা। আমাদের দেবতা হতে হবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

সংবাদ প্রতিবেদন

সন্ত্রাসবাদীদের অনুশীলনের শিকার এখন কুকুর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সন্ত্রাসবাদীদের নৃশংসতার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না অবলা জীবেরাও। সন্ত্রাসবাদীরা বহুদিন ধরেই নিরীহ কুকুরদের তাদের লক্ষ্যবস্তু অনুশীলনের মাধ্যম বানালেও অতি সম্প্রতি তা পুলিশের গোচরে এসেছে। কেরলের কোজিগড়, মালাপ্পুরম এবং ত্রিশূল জেলায় অনেকদিন ধরেই ক্ষত-বিক্ষত কুকুরের দেখা মিলছিল। অন্যদিকে এমনকী বাড়ির কুকুর হারিয়ে গিয়েছে বলে পুলিশের কাছে অভিযোগও আসছিল। বিষয়টিকে দু'য়ে দু'য়ে চার করতেই তদন্তে উঠে আসে যে সন্ত্রাসবাদীদের নির্মমতার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না অবলা প্রভুভক্ত জীবগুলিও। স্রেফ মালাপ্পুরম জেলাতেই বহু স্থানে গত কয়েকমাসে কয়েকজন পঙ্গু ও নিহত কুকুরের দেখা মিলেছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে শতাধিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এবং অন্তত ছ'জন এর সঙ্গে জড়িত বলে মনে করছে পুলিশ। রাজ্যের গোয়েন্দা দফতরের রিপোর্ট বলছে, হাত মকশ' করার উপাদান হিসেবে ওই কুকুরগুলিকে ব্যবহার করেছে 'একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মৌলবাদীরা'। স্বাভাবিকভাবেই গোয়েন্দা দফতরের এই রিপোর্টে ঘুম ছুটে যাবার জোগাড় রাজ্য প্রশাসনের। রাজ্যের পুলিশমন্ত্রী থিরুভাঙ্গুর রাধাকৃষ্ণণ কেরল পুলিশ ও বনদপ্তর যৌথভাবে এই ঘটনাটিকে খতিয়ে দেখছে বলে জানিয়েছেন।

কেরল পুলিশ সূত্রের খবর, কুকুর নিগ্রহের ঘটনাগুলি এতদিন তাদের নজরে এলেও একে মামুলি সমাজবিরোধীদের কাণ্ড বলেই মনে করেছিল তারা। কিন্তু আই বি-র রিপোর্টে এর পেছনে সন্ত্রাসবাদী সম্ভাবনার কথা উঠে আসায় এই মুহূর্তে প্রশাসন এককথায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এই কারণেই এতদিন এইসমস্ত ঘটনায় নথিভুক্ত করা হয়েছিল অতি মামুলি মামলা— ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১৯ নং ধারা (গবাদি পশু ইত্যাদিকে পঙ্গু বা হত্যা করা) এবং পশুক্লেশ নিবারণের বিভিন্ন ধারায়। গোয়েন্দা ব্যুরোর এই রিপোর্টটি আরও গুরুত্ব পেয়েছে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এন আই এ)-র সাম্প্রতিকতম রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে। এন আই এ-র রিপোর্ট বলছে, দেশের মধ্যে সন্ত্রাসের অন্যতম সেরা উৎসমুখ এখন কেরল। এছাড়াও রাজ্যের অধিকাংশ জায়গাতেই যেভাবে কুকুর-অপহরণের অভিযোগ নথিভুক্তিকরণের সংখ্যা দিনকে দিন বাড়ছে তাতে সন্ত্রাসবাদীদের কালো ছায়াই প্রকটিত হচ্ছে বলে গোয়েন্দাদের অনুমান। মালাপ্পুরম জেলায় কুকুর-অপহরণের অভিযোগ সবচেয়ে বেশি নথিভুক্ত হওয়া থানাগুলির মধ্যে রয়েছে কালিকাভু, পেরিন্থালমান্না, পন্ডিক্কর, চাঙ্গারামকুলাম, কোট্টাক্কাল। আর সরকারি তথ্যই বলছে এই জেলাগুলি মুসলমান গরিষ্ঠ। কোজিগড় ও পালাক্কাড জেলাতেও এধরনের ঘটনা পুলিশি নথিভুক্ত হয়েছে।

গোয়েন্দাদের উদ্বেগ বাড়িয়েছে তামিলনাড়ুর লাগোয়া ওয়ানাদ জেলার ঘটনা। এখানে চেরামবাদী-ভাদুভাকালে কয়েকটি মুসলমান মৌলবাদী গোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ শিবির হয়ে গিয়েছে কিছুদিন আগে। সেখানে মার্শাল আর্টও শেখানো হয়। এলাকার বহু মুসলিম যুবক তাতে অংশ নেয়। এরপরই দেখা যাচ্ছে, ৩০-রও বেশি কুকুর গলায় ও মাথায় আঘাত নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কুকুরগুলির আঘাত পরীক্ষা করে গোয়েন্দারা মনে করছেন, তলোয়ার জাতীয় কিছু অস্ত্র দিয়ে তাদের আঘাত করা হয়েছে। আর এধরনের কাজের মোটিভ যা নিয়ে কিছুদিন আগেও কেরল পুলিশ ছিল ঘোর অন্ধকারে আজকে তা জলের মতোই পরিষ্কার। কারণ কিছুদিন আগে গোয়েন্দা রিপোর্টে সন্ত্রাসবাদীদের তলোয়ার জাতীয় অস্ত্র প্রশিক্ষণের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল।

তাই আপাত পশু-ক্লেশ নিবারণের মতো অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ স্তরে বিষয়টি আটকে থাকলেও এটি ভবিষ্যতে দেশের সুরক্ষা প্রশ্নে যে অশনি-সংকেত বহন করছে বিষয়টি তা বলাই বাহুল্য।

খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্প সর্বপ্রথম চালু হচ্ছে ছত্তিশগড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতে ছত্তিশগড়ই প্রথম রাজ্য যারা খাদ্য নিরাপত্তা বিল আনতে চলেছে। বিজেপি শাসিত এই রাজ্য বিধানসভার আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে গ্রাম ও শহরের দরিদ্র মানুষদের ভর্তুকি-তে খাদ্য শস্য সরবরাহের জন্য বিল আনছে। ইউপিএ-কে পেছনে ফেলে এই জনপ্রিয় প্রকল্পটিকে রূপ দিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। উল্লেখ্য, গত ৪ নভেম্বর দিল্লীর রামলীলা ময়দানে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী ঘোষণা করেছিলেন যে সংসদের অধিবেশনে তারা খাদ্য নিরাপত্তা বিল পেশ করবেন। কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রমন জানিয়েছেন, কেন্দ্রের আগেই এই বিল বিধানসভায় আমরা পাশ করিয়ে নেব।

২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ইস্তাহারে খাদ্য নিরাপত্তা বিলের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু তা এখনও দিনের আলো মুখ দেখেনি।

ছত্তিশগড়ে খাদ্য শস্যের নিরাপত্তা

- ছত্তিশগড়ের দারিদ্র্য পীড়িত ৩৫ লক্ষ পরিবার, বলা যায়, রাজ্যের ৫৫ শতাংশ মানুষ ১০,৮৪৬টি রেশন দোকানের মাধ্যমে প্রতি মাসে ৩৫ কিলোগ্রাম খাদ্যশস্য পাবে।
- এদের মধ্যে যারা খুবই দরিদ্র, তারা ১ টাকা কিলো দরে খাদ্যশস্য পাবে।
- ২০১৩-র এপ্রিল থেকে দরিদ্র পরিবারগুলিকে লিটার পিছু ৪০ টাকা দরে ভোজ্য তেল (edible oil) দেওয়া হবে।

সংবাদ প্রতিবেদন

প্রস্তুতি শুরু ঐতিহাসিক শিবিরের

হিন্দু জাগরণ আন্দোলনের মাইলস্টোন হোক বিবেকানন্দ যুব শিবির : ভাইয়াজী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সমাজের এখন এক শক্তি দর্শন দরকার। সজ্জন শক্তিই আশার আলো নির্মাণ করতে পারে। বাস্তব হলো দুর্জন শক্তি সংগঠিত হলেও সজ্জন শক্তি সংগঠিত নয়। সঙ্ঘ সজ্জন শক্তির সংগঠন করতে চায়। গোড়া থেকেই সঙ্ঘ এই কাজ শুরু করেছে। সঙ্ঘ সমাজে প্রচলিত কুরীতি, অস্পৃশ্যতা, দুর্নীতি যেমন দূর করতে চায়, সেইসঙ্গে সজ্জন শক্তিকেও সংগঠিত করতে চায়। ঘটনা হলো সমাজের এক বৃহৎ অংশ সঙ্ঘের শাখায় আসেন না, যেমন, মহিলা, হিন্দু বিরোধীরা এবং অহিন্দুরা। আবার কিছু নিরপেক্ষ আছেন যাঁরাও আসেন না। কিন্তু দেশের যাঁরা মঙ্গলচিন্তা করেন, তাঁদের সংগঠিত হওয়া দরকার। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ সুরেশ যোশী (ভাইয়াজী) ১০ নভেম্বর কলকাতায় কেশব ভবনে আয়োজিত বিবেকানন্দ যুব শিবিরের স্বাগত সমিতির সদস্যদের সভায় একথা বলেন। উল্লেখ্য, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মসার্ধশত বার্ষিকী উপলক্ষে সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ শাখা ২০১৩ সালে ১১, ১২, ১৩ জানুয়ারি তিনদিন ব্যাপী বিবেকানন্দ যুব শিবিরের আয়োজন করেছে। কল্যাণীর কাছে গয়েশপুর গোশালা ময়দানে এই তিনদিনের আবাসিক যুব শিবির হবে। যাদের বয়স ১৫ থেকে ৪০-এর মধ্যে এমন স্বয়ংসেবকেরাই এই শিবিরে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ১০,০০০ শিক্ষার্থী স্বয়ংসেবক এই শিবিরে অংশগ্রহণ করবেন বলে উদ্যোক্তরা জানিয়েছেন। সঙ্ঘের রীতি অনুযায়ী অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককেই শিবিরের নির্ধারিত শুল্ক ১৫০ টাকা, যাতায়াতের খরচ এবং শিবিরের জন্য নির্দিষ্ট পোষাকের (গণবেশ) ব্যয় নিজেদেরই বহন করতে হবে। ইতিমধ্যে গত ৯ নভেম্বর শিবিরস্থলে ভূমিপূজন ও যজ্ঞ সম্পন্ন হয়েছে। সেখানেও ভাইয়াজী যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দান করেন।

গত ৯ নভেম্বর বিবেকানন্দ যুব শিবির - ২০১৩-র ভূমিপূজনের অনুষ্ঠান মঞ্চে।

স্বাগত সমিতির এই সভার সভাপতিত্ব করেন সমিতিরই সভাপতি মেজর জেনারেল কে কে গাঙ্গুলী (অবসরপ্রাপ্ত)। সমাজের বিবিধ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ৫০ জনেরও বেশি ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ভাইয়াজী বলেন, স্বাধীনোত্তর ভারত যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি করেছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু দেশের এই প্রগতিতে রাজনীতিক নেতাদের অবদান সামান্যই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো আমরা আমেরিকার, পাশ্চাত্যের জীবনশৈলী অনুসরণ করতে চাইছি। যেখানে ভোগই শুধু লক্ষ্য। যেখানে পয়সা ছাড়া কিছু মেলে না। আমাদের যুবকদের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে।

কেবল ভারতই পারে মানবতাকেন্দ্রিক বিকাশ। ভারত সুপার পাওয়ার নয়, সুপার রাষ্ট্র (জাতি) হতে চায়। ক্ষমতাধর নয়, চায় শক্তিশালী আদর্শের প্রতিষ্ঠা। ভারত ভারত হয়েই থাকতে চায়। সঙ্ঘ সমাজের মধ্যে দেশভক্তি, অনুশাসন, কর্তব্যপরায়ণতা নির্মাণের কাজ করে চলেছে। এই জন্যই যুব শিবিরের আয়োজন। বাংলার হিন্দু জাগরণ আন্দোলনে এটা একটা মাইলস্টোন হবে—এটাই প্রত্যাশা।"

সভাপতির ভাষণে কে কে গাঙ্গুলী বলেন, "আমি একজন সৈনিক। যে চিন্তার ভিত্তিতে এই শিবিরের আয়োজন, এটা শুধু আমরা করব তাই নয়, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ যুব শিবির হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ১৮৯৭ সালে লোকমান্য তিলক স্বামীজীকে স্বাধীনতা শীঘ্র লাভের জন্য কিছু করতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। প্রত্যুত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন, তিনি তা পারেন, কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর দেশ পরিচালনার জন্য মানুষ কই? মানুষ চাই। সঙ্ঘ স্বামীজীর সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে কাজ করে চলেছে।

অন্য রাজ্যের তুলনায় জনকল্যাণে অনেকটাই এগিয়ে আছে গুজরাট

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পাঁচ বছর আগে গুজরাট সরকার যে দুটি প্রকল্প চালু করেছিল, তারই ফলে সেখানে আর্থিক উন্নয়ন হার ১০ শতাংশে পৌঁছেছে। এই দুটি প্রকল্পের একটি ১৮ হাজার কোটি টাকার বনবন্ধু যোজনা, যার লক্ষ্য হলো জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়ন আর দ্বিতীয়টি হলো ১১ হাজার কোটি টাকার সাগরখেড়ু যোজনা। সমুদ্র তীরবর্তী, বিশেষত মৎস্যজীবীদের উন্নয়নই এই যোজনার লক্ষ্য। রাজ্যের জনজাতি অধ্যুষিত ৪২টি মহকুমা এবং সমুদ্রতীরবর্তী ৩৮টি মহকুমার বাসিন্দারা এই দুই যোজনার দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। এই দুটি প্রকল্পই ২০০৭-এ শুরু হয়েছিল এবং পরিকল্পনা মতো শেষও হয়েছে ২০১১ সালে। গুজরাট সরকারের এই পরিকল্পিত প্রয়াসে উন্নয়নের স্পর্শ পৌঁছে গিয়েছে রাজ্যের প্রত্যন্ত গ্রামের প্রান্তিক মানুষটি থেকে রাজধানী আমেদাবাদের ধনী ব্যবসায়ীর গৃহ পর্যন্ত।

২০০৭-এর আগে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় কোনও বিজ্ঞান পড়াশোনার স্কুল ছিল না। এখন সেখানে সরকার প্রাথমিকভাবে কৃষির উপর জোর দিচ্ছে। ২০১০-১১ সালে কৃষক ও দারিদ্র্য সীমারেখার নিচে থাকা লোকেদের সাহায্যের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এরকম একটি প্রকল্প হলো গরীব সমৃদ্ধি যোজনা যাতে ১৫০টি পৌরসভার পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হবে। ইতিমধ্যে গুজরাট সরকার নগরোন্নয়নের জন্য ৩০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। কিন্তু এজন্য কৃষিখাতে বরাদ্দের কোনও অবহেলা করা হয়নি। গুজরাট ৮ লক্ষ হেক্টর কৃষিজমি এখন সেচের আওতায় আনা হয়েছে। এক দশক আগে সেচযুক্ত জমির পরিমাণ ছিল ১০ হাজার হেক্টর। ইন্টারন্যাশন্যাল ওয়াটার ম্যানেজমেন্টের কলম্বোস্থিত অধিকর্তা তুষার সাহ ২০১২ সালে গুজরাটের সৌরাষ্ট্র ও মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ এলাকার কৃষি বৃদ্ধি নিয়ে একটি তুলনামূলক সমীক্ষা চালিয়েছিলেন।

দু' দশক আগে এই দুই এলাকার কৃষির অবস্থা একই রকম ছিল। কিন্তু আজ কৃষি ক্ষেত্রে সৌরাষ্ট্র বিদর্ভের তুলনায় প্রায় তিন গুণ উন্নত।

বাংলাদেশে হিন্দুরা অত্যাচারিত জেনেও ভারত কোনও প্রতিবাদ করেনি

গূঢ়পুরুষের কলম

বাংলাদেশে ইসলামি মৌলবাদী দল বেগম খালেদা জিয়ার বি এন পি-কে নির্বাচনে হারিয়ে ক্ষমতায় এসেছে শেখ হাসিনার আওয়ামি লিগ। একটা প্রচার আছে যে লিগ বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষাকারী বন্ধু দল। তাই যদি হবে তবে কীভাবে এবার দুর্গাপুজোর মুখে কক্সবাজারের রামুতে ও পটিয়ায় টানা তিনদিন বৌদ্ধ বসতিতে জামায়েত-এ-ইসলামির সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা হামলা চালায়। রামু উপজেলার ৭টি বৌদ্ধমঠ, বৌদ্ধ-হিন্দুদের ৩০টি বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। শনিবার (১৩ অক্টোবর) রাত থেকে সোমবার পর্যন্ত (রামু ও পাটিয়ায়) দফায় দফায় তাণ্ডব চালায় ইসলামি উগ্রপন্থীরা। ধ্বংস হয়ে যায় রামুর 'সাদা চিং-লাল চিং', মৈত্রী বিহার, সীনা বিহার, জাদিপাড়া বৌদ্ধ বিহার, বিমুক্তি বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্র। মিঠাছড়ি ও বড়ুয়া-পাড়ার কমপক্ষে ৩০টি বসতবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ভাঙচুর হয় শতাধিক বাড়ি। মিঠাছড়ির বনবিহারটি ধ্বংস করা হয়। সংখ্যালঘু বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর হামলা হয় মিথ্যা একটি অজুহাতে। কক্সবাজারের জামায়েত নেতারা প্রচার করে যে রামুর বৌদ্ধপাড়ার বাসিন্দা উত্তম বড়ুয়ার ফেসবুকে কোনও একটি বিদেশি সূত্র থেকে কোরআন শরিফ অবমাননা করে একটি ছবি পোস্ট করা হয়েছে। তাই বৌদ্ধদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। শনিবার রাত ১০টায় কয়েক হাজার সশস্ত্র জামায়েত দুর্বৃত্ত মিছিল করে রামু উপজেলায় বসবাসকারী বৌদ্ধদের পাড়াগুলি ঘেরাও করে। রাত ১১-৩০ মিঃ হামলা শুরু হয়। জামায়েতের মিছিল শুরু হতেই স্থানীয় বৌদ্ধ নেতারা পুলিশকে জানান। লাভ হয়নি। কক্সবাজারের পুলিশ সুপার সেলিম মহম্মদ জাহাঙ্গির সাফাই দিয়েছেন, কয়েক হাজার সশস্ত্র জামায়েত সমর্থকের মোকাবিলা করার শক্তি স্থানীয় থানার পুলিশের ছিল না। রবিবার বিপুল সংখ্যক দাঙ্গা দমনকারী সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী পাঠিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়। কিন্তু ততক্ষণে জামায়েতের জেহাদিরা রামুর ঐতিহাসিক ৫০০ বছরের পুরানো বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস করে দিয়েছে।

বাংলাদেশে শুধু হিন্দুরাই নয়, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষজন লাগাতার নির্যাতনের শিকার। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্পত্তিকে আজও শত্রু সম্পত্তি বলে মনে করা হয়। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টানরা সেখানে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক। ১৯৫১-২০১১-র সাতটি ধর্মভিত্তিক জনগণনা থেকে স্পষ্ট যে মুসলিম প্রধান

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমছে। ১৯৫১ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণনায় বলা হয়েছিল মোট জনসংখ্যার ২২ শতাংশ হিন্দু এবং শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ বৌদ্ধ। ২০১১-র জনগণনায় দেখা যাচ্ছে হিন্দুর সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৮.৫ শতাংশে। বৌদ্ধদের সংখ্যাও কমেছে। শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে শূন্য দশমিক ৬ শতাংশে। অন্য আরেকটি পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে, ১৯৪১ সালে পূর্ববঙ্গে হিন্দুরা ছিলেন জনসংখ্যার ২৮ ভাগ। ১৯৫১ সালে ২২ ভাগ। এভাবে ১৯৬১ সালে ১৮.৫০, ১৯৭১ সালে ১৩.৫০, ১৯৮১ সালে ১২.১৩ ভাগ, ১৯৯১ সালে ১০.৫ ভাগ এবং ২০০১ সালে ৯.২০ ভাগ। ২০১১-র সর্বশেষ জনগণনায় বাংলাদেশে হিন্দুর সংখ্যা আরও কমে এখন ৮.৫ ভাগ। তুলনায় বৌদ্ধদের সংখ্যা ততটা হ্রাস পায়নি। হিন্দুদের সম্পত্তি বেশি ছিল। তাই ইসলামি জিগির তুলে হিন্দুদেরই বেশি সংখ্যায় উৎখাত করা হয়েছে। দখল করা হয়েছে হিন্দু সম্পত্তি। এই সহজ কথাটা মানতে আমাদের এত দ্বিধা কেন?

বাংলাদেশ সরকার অবশ্য বলছে, আদিকাল থেকেই এখানে হিন্দুদের জন্মহার কম। জন্মহার (টোটাল ফার্টিলিটি রেট) কম হওয়াতে হিন্দু জনগোষ্ঠী ছোট হয়ে আসছে। এটা শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতো সত্যকে আড়াল করার ব্যর্থ চেষ্টা। সত্য হচ্ছে, সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্য, নির্যাতন, খুন, লুঠতরাজ, হিন্দু মেয়েদের ধর্ষণ এবং ধর্মান্তরকরণ বাধ্য করেছে হিন্দুদের দেশত্যাগ করতে। কেউ স্বেচ্ছায় সাত পুরুষের ভিটেমাটি ত্যাগ করে না। বাংলাদেশে জামায়েতের মতো সাম্প্রদায়িক শক্তি পরিকল্পিতভাবে সংখ্যালঘুদের ভিটেমাটি ছাড়া করছে। কক্সবাজারে বৌদ্ধদের উপর গত মাসে সশস্ত্র হামলা চালিয়েছে জামায়েত। তার আগেই চলতি বছরে একই কায়দায় মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে ধর্মীয় জিগির তুলে চট্টগ্রামের হাটহাজারি, সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ, কুড়িগ্রামের চিরির বন্দরে হিন্দু সম্পত্তি অবাধে লুঠ করেছে। বাংলাদেশ সরকার হিন্দুদের প্রাণ, ইজ্জত, সম্পত্তি রক্ষায় বিশেষ আগ্রহ দেখায়নি। তবে দোষ দেব ভারত সরকার এবং দেশের সংবাদমাধ্যমকে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ চলছে জেনেও ভারতের বিদেশমন্ত্রক আজ পর্যন্ত কূটনৈতিক স্তরে কোনও প্রতিবাদ করেনি। চাপ সৃষ্টি করা দূরের কথা। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের ঘটনা প্রকাশ করে না।

অথচ বাংলাদেশের পত্রপত্রিকায় জামায়েতের হিন্দু নির্যাতনের নানা ঘটনা প্রকাশিত হয়। একটা কথা মানতেই হবে বাংলাদেশের সংবাদপত্র যতটা স্বাধীন ও নির্ভীকভাবে সংবাদ পরিবেশন করে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ততটা নয়। ভারতের সংবাদমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করে বিদেশী শক্তির দেশজ প্রতিনিধিরা। তাই লক্ষ্য করবেন, ইসলাম বিরোধী বা খৃষ্ট বিরোধী তুচ্ছ ঘটনাও ভারতীয় সংবাদপত্রে ফলাও করে ছাপা হয়। পাকিস্তান ও বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের ঘটনা প্রকাশিত হয় না।

সংবাদ প্রতিবেদন

পশ্চিমবঙ্গ কি আবার ভাগ হবে?

দেবব্রত চৌধুরী॥ আমাদের দেশ ভারতবর্ষকে ইউরোপ থেকে আসা বণিকরা 'ইন্ডিয়া' নামেই চিহ্নিত করেছিল। আসলে 'ইন্ডিয়া' শব্দটি হিন্দুস্থান নামের এক বিকৃত রূপ। আবার হিন্দুস্থান নামটি দিয়েছিল হিন্দুকুশ পাহাড় পেরিয়ে আসা আরবরা। কারণ এদেশের অধিবাসীদের তারা 'হিন্দু' বলেই চিহ্নিত করেছিল। পরবর্তীকালে এদেশে আসা পাঠান-লোদী-খিলজী-মোঘলরা দেশটা জবর দখল করে যখন শাসক হয়ে উঠল, তখন এদের রাজত্বে হিন্দুস্থানের অধিবাসী হিন্দুদের অবস্থা হলো ক্রীতদাসদের মতো। তাদের কিছুমাত্র স্বাধীনতা ছিল না, তারা ভাল পোষাক পরতে পারতো না, পারতো না ঘোড়ায় চড়তে। এমনকী মাথা উঁচু করে চলতেও পারতো না। মুসলমান দেখলেই তাকে সেলাম করতে হোত। ভেঙে দিয়েছিল সহস্র হিন্দু মন্দির। এই অসহায় অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে কয়েক হাজার হিন্দু নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্মমত গ্রহণ করে। মুসলমান শাসকরা পুরস্কার হিসেবে তাদের জিজিয়া কর দেওয়া থেকে মুক্তি দেয়। এই ধর্মত্যাগী হিন্দুদের মুসলমানরা কিন্তু প্রথম শ্রেণীর মুসলমানদের মর্যাদা দিত না আজও দেয় না।

মুসলমানরা হিন্দুস্থানে হিন্দুনারীজাতির উপর যে অকথ্য অত্যাচার করেছে তার কোনও সীমা নেই। মুসলমানরা এদেশে নারীদের মনে করত ভোগ্য বস্তু। কিন্তু এদেশের মূল অধিবাসী হিন্দুদের কাছে নারীজাতি পূজিত হয় মাতৃজাতি রূপে। ইসলামপন্থীদের এই জাতীয় অমানবিক কাজের বিরুদ্ধে সম্রাট আকবর তাঁর শাসনকালে দীনইলাহী নামে এক ধর্মের প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এতবড় সম্রাট হয়েও আকবর এই ধর্ম প্রচারে বেশিদূর এগোতে পারেননি। কারণ মুসলমান সমাজ তার ধর্মীয় নির্দেশের জন্য মানুষের প্রকৃতিগত দুর্বলতা কাম, ক্রোধ, লোভ থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল না। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে তুরস্ক দেশে নব্য তুরস্কের জন্মদাতা কামাল আর্তাতুক ও আফগানের রাজা আমানুল্লা দেশে আধুনিকীকরণের জন্য ইসলাম ধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু তারাও বেশিদূর এগোতে পারেনি। স্বনামধন্য ইংরেজ সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক এইচ জি ওয়েলস তাঁর 'আউটলাইনস অফ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি' গ্রন্থে বলেছেন, ''মুসলমান ধর্ম হচ্ছে দুষ্কৃতীদের দর্শন।'' এইচ জি ওয়েলস-এর বইখানি সমগ্র মুসলিম দুনিয়ায় প্রচার নিষিদ্ধ। স্যার যদুনাথ সরকার মোঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব সম্পর্কে লেখা পাঁচ খণ্ডে পূর্ণ বৃহৎ গ্রন্থটিতে এবং অন্যান্য আরও বহু লেখায় ভারতে মুসলমান রাজত্বে অমুসলমানদের উপর পাশবিক অত্যাচারের কথা বলেছেন এবং এও বলেছেন যে এই অত্যাচার করা সম্ভব হয়েছে বর্তমান ক্লীব ও নপুংসক হিন্দু রাজনীতি ব্যবসায়ীদের জন্য।

কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র লিখেছেন ''মহাত্মার অহিংসা অসহযোগ -এর যুগে এদেশে বহু নেতারা ঘোষণা করছে হিন্দু-মুসলমান মিলন চাই-ই-চাই। এ না হলে স্বরাজ বলো স্বাধীনতা বলো তার কল্পনা করাও পাগলামি।'' তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন— ''এই হিন্দু মুসলমান মিলন আলেয়া বা মরীচিকার মতো'', এই মিলন ছায়াবাজীর রোশনাই যোগাতেই ভারতে হিন্দুদের প্রাণান্ত হইল। সময় ও শক্তি যে কত বিফলে গেল তার তো হিসেব নেই। মহাত্মার খিলাফত আন্দোলন দেশবন্ধুর প্যাক্ট— এ সবই মুসলমান সমাজকে তোষণ করা এক কথায় ঘুষের ব্যাপার। মিলনের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি খেটেছিলেন মহাত্মাজী ''হিন্দু মুসলমান মিলনের জন্য দীর্ঘ একুশ দিন উপবাস করিয়া ভাবিয়াছিলেন এবার হয়তো ভারতের মুসলমান সমাজের তাহার এত যন্ত্রণা দেখিয়া দয়া হইবে। কিন্তু মিঃ মহম্মদ আলী জিন্না অশ্রুপাত করিয়া কহিলেন আহা বড় ভালো লোক মহাত্মাজীটি। ইঁহার সত্যি উপকার করতে হবেই। অতএব আগে মক্কায় গিয়া পীরের সিন্নি দিই। পরে ফিরিয়া আসিয়া কলমা পরাইয়া কাফের ধর্ম ত্যাগ করাইয়া তবে ছাড়িব। শুনিয়া মহাত্মাজী কহিলেন— পৃথিবী দ্বিধা হও।'' মহাত্মা গান্ধী শত চেষ্টা করেও মুসলমানদের মন জয় করতে পারেননি, পারেননি দেশ-ভাগ রোধ। এই বিভাজনের কারণ মনে হয় দেশে ১৯৪৬ সালে বৃটিশ রাজত্বে শেষ যে নির্বাচন হয় সেই নির্বাচনে সব দলের মুসলিমরা যা প্রায় ৯৮ শতাংশ এক বাক্যে পাকিস্তান দাবি সমর্থন করেছিলেন। যদিও সেই সময়ে কংগ্রেস দলের সভাপতি ছিল মৌলানা আবদুল কালাম আজাদ। যিনি একজন মুসলমান। দেশ বিভাজনের ফলস্বরূপ পূর্ব-পাকিস্তানে মুসলমান (আনসার বাহিনী)-দের অত্যাচারে পূর্ববঙ্গ থেকে প্রায় ১.৭৫ কোটি হিন্দু বাঙালি পশ্চিমবাংলায় চলে আসতে বাধ্য হয়। অথচ যারা পাকিস্তান চেয়েছিল সেই মুসলমানরা মাত্র ৫৮০০০ পূর্ব-পাকিস্তানে যায়। অবিভক্ত বাংলায় ছিল ২৮টি জেলা। তার মধ্যে ১৭ জেলা প্রায় ৬০ শতাংশ দিয়ে দিতে হয়। যদিও তখন বাংলা মুসলমান সংখ্যা ছিল ৫২ শতাংশ মাত্র। তার সামান্য অংশই পূর্ব- পাকিস্তানে যায়।

কিন্তু আজ এক নুতন সমস্যা সৃষ্টি হতে চলেছে যা এই বাংলায় হিন্দুদের কাছে চিন্তার কারণ হতে পারে। ১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় মুসলিম সদস্য ছিলেন ৫ জন। আজ কংগ্রেস, সিপিএম ও তৃণমূলের দৌলতে মুসলিম বিধায়ক হয়েছেন ৬০ জন। তাই শুরু হয়ে গেছে দাবি— মুসলমান মুখ্যমন্ত্রী চাই, চাই মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, চাই সংরক্ষণ— চাকুরীতে, সমান সংরক্ষণ হাসপাতালে, মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামে ডাকঘর, সর্বোপরি হিন্দুধর্মালম্বীদের প্রতি ঘৃণামূলক প্রচার তার উদাহরণ। 'হিন্দুত্ব ও ইসলাম' পুস্তকে মনিরুদ্দিন খান ১০নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন হিন্দুশাস্ত্র প্রভৃতি পর্নোগ্রাফিক অর্থাৎ অশ্লীলতা পূর্ণ। এই শাস্ত্র যৌনপন্থী ও রক্ত সম্পর্কের মধ্যে নানা অবৈধ প্রেম কাহিনী বলা আছে। এদের ধর্মের আচারে নগ্নমূর্তি গুরুত্ব পায়। এরা লিঙ্গ পূজা করে। এদের দেবতা ব্রহ্ম নিজ কন্যা সরস্বতী ও আর এক দেবতা বিষ্ণু তুলসী নামের এক মহিলার সঙ্গে সহবাস করে হিন্দুত্ব হলো— একটি শ্বাসহীন শব্দ। বইটির প্রশাসক 'মল্লিক ব্রাদার্স', ৫৫নং কলেজস্ট্রিট কলকাতা-৭৩। মমতা সরকার বইটি নিষিদ্ধ করেননি। উল্টে হিজাব পরে নামাজ পড়ার নিজের ছবি কলিকাতায় ছেয়ে দিয়েছেন। হিন্দুরা ভীত আবার নাকি দেশ ভাগ হয়— বৃটিশরা হিন্দুস্থান থেকে ইস্তান ইণ্ডুস করেছিল, কিন্তু ফিরিয়ে দিতে হবে আমাদের হিন্দুস্থান। তাই এদেশের হিন্দুস্থানীদের যাত্রা শুরু করতে হবে। নচেৎ বিপদ।

শুধু লোবাগ্রাম নয়, সারা রাজ্যেই পুলিশ-প্রশাসন ব্যর্থ

নিশাকর সোম

বীরভূমের দুবরাজপুরের লোবাগ্রামে বেঙ্গল-এমটা গ্রুপের খননের যন্ত্র পড়েছিল। গ্রামবাসীরা জমি হারানোর আতঙ্কে এই যন্ত্রটাকে আটকে রেখেছিল। এই যন্ত্রটাকে 'উদ্ধার' করার জন্য পুলিশ প্রশাসন নামলো। গ্রামবাসীরা তীর ছুঁড়লো— গুলি চললো, আহত হলেন প্রায় ৫০ জন। পুলিশ-জনতার খণ্ডযুদ্ধ হলো। স্বরাষ্ট্রসচিব থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন— পুলিশ গুলি চালায়নি। স্বরাষ্ট্রসচিব বলেছেন— গ্রামবাসীরাই প্রথমেই পুলিশের উপর চড়াও হয়ে আক্রমণ করেছিল। শুধু লোবাগ্রাম নয়, বাঁকুড়াতেও পুলিশ-জনতা সংঘর্ষ হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য 'মাওবাদীদের' হাত আছে! বিরোধী নেত্রী আগে বলতেন— 'সরকারের দোষ, বামফ্রন্টের অত্যাচার— মাও-ফাও নেই। রাজ্যে মাওবাদী নেই।" এখন তো উল্টোকথা বলছেন! অথচ তারাই যখন বিরোধী, তখন সরকারি অফিস ভাঙচুর করা থেকে ট্রামবাস পোড়ানো পর্যন্ত চলেছিল। শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় কিন্তু গুলি চালনা স্বীকার বা অস্বীকার প্রথমে না করলেও এখন মুখ্যমন্ত্রীর 'চাপে' পুলিশের গুলি চালনার কথা অস্বীকার করলেন। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য— গ্রামবাসীদের দিয়ে তীর-ছোঁড়ানো হয়েছে। এখানকার পঞ্চায়েত তো তৃণমূলের। তারা কি কিছুই খবর রাখতো না? নাকি গ্রামের সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন? গোয়েন্দাদের কাছে কি কোনও খবর ছিল না? পুলিশ প্রশাসন ব্যর্থ। শুধু এখানে নয় সমগ্র রাজ্যেই পুলিশ প্রশাসনের ব্যর্থতা প্রকটিত। ছিনতাই-ডাকাতি-লুঠতরাজ বেড়ে গেছে! পুলিশ তৃণমূলের গন্ধ দেখলেই আর অগ্রসর হয় না। এতো সিপিএমের রাজত্বের পুনরাবৃত্তি? বীরভূমের এসপি-কে তো শাস্তিমূলক ছুটিতে (কম্পালসারি লিভ) পাঠানো হলো।

দুবরাজপুরে পুলিশি অভিযান নিয়ে বিতর্কের ধোঁয়াসা সৃষ্টি হয়েছে! লোবা গ্রামে পুলিশি-অভিযানে খোদ শিল্পমন্ত্রীর নাম জড়িয়ে গেছে। বীরভূমের বিধায়ক চন্দ্রনাথ সিংহও প্রশাসনকে চাপ দিচ্ছিলেন বলে শোনা যাচ্ছে। ঘটনার গতি-প্রকৃতি দেখে স্পষ্ট বেঙ্গল-এমটাকে রাজ্য সরকার সহায়তা করার জন্য গ্রামের মানুষজনের জমি হারানোর আতঙ্কে ছিল। যদি যন্ত্রটি গ্রামে থেকেই যেতো তাতে কি ক্ষতি হোত? এদিকে বেঙ্গল- এমটা গোষ্ঠীও লোবাগ্রামের ঘটনায় ক্ষুব্ধ। শুধু লোবাগ্রাম নয় রাজ্যে দিকে দিকে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। হলদিয়াতেও ক্ষুব্ধ বন্দরকর্মীরা। সংকট সমাধানের বা বামফ্রন্টের ব্যবস্থার পরিবর্তনের উদ্যোগ সরকার নেয়নি কেন? বাম সরকারের

বদমাইসি বজায় রেখে দুবরাজপুরের জমি নিয়ে ডিভিসি-এমটা গোষ্ঠীর সঙ্গে গ্রামবাসীদের বিরোধ রয়েছিল। সেটা দূর না করে মন্ত্রী বিধায়ক গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে দ্রুত পুলিশি ব্যবস্থা নেবার জন্য কি বলেননি?

বেঙ্গল-এমটা গ্রুপ খনির এলাকা নির্ধারণ না-করে মাটি কাটছে আর সেই মাটি হিংলাতে ফেলা হচ্ছে। বিডিও-র সঙ্গে বৈঠকে এই কাজকে বেআইনি বলা হয়। উল্লেখ্য, হিংলা নদীতে মাটি ফেলার ব্যাপারে পরিবেশবিদ্ সুভাষ দত্ত অভিযোগ করেছিলেন। কৃষিজমি রক্ষা-কমিটি গ্রামবাসীদের সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও জমির দাম নিয়ে কথা তুললে মহকুমা শাসক তা মেনে নিয়েছিলেন। এই বিরোধ মেটানোর জন্য কোনও উদ্যোগ বেঙ্গল-এমটা গোষ্ঠী নেয়নি। ঠিক এই সময়েই এমটা গোষ্ঠী স্থানীয় তৃণমূল সাংসদকে নিয়ে মহাকরণে এসে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দু'কোটি টাকা দান করে! ঠিক যেমন সি এস সি-র মালিক ৫ কোটি টাকা দিয়ে মমতার শিল্প কর্ম কিনেই বিদ্যুতের দাম বাড়াল।

এরপরও কি বলতে হবে পরিবর্তনের সরকার বাম-সরকারের মতো ধনী-তোষণ আর কৃষক-নিষ্পেষণ চালাচ্ছে না? বলা হচ্ছে এমটা গ্রুপের সঙ্গে জ্যোতি বসুর ছেলে জড়িত! তাতে ভয় কিসের? এটাই কি যুক্তি। শুধু সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ নয়— ক্ষোভ দেখা যাচ্ছে মহাকরণের সচিবস্তরেও। শুধু টুকটুক কুমার নয়— একাধিক সচিব রাজ্য- প্রশাসন থেকে হাতগুটিয়ে নিতে চাইছে। পুলিশেরও মধ্যে "চলে যাওয়া"-এর ঝোঁক দেখা যাচ্ছে কেন? এছাড়া মহাকরণ-এর কংগ্রেসি- সংগঠনের নেতাদের ও কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতাদের বদলি করা হচ্ছে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে মহাকরণ থেকে বদলির আদেশ দেওয়া হয়েছে। এইভাবেই মহাকরণে তৃণমূল সংগঠনের শক্তিকে কি বাড়ানো হবে? ১৫ বছর যাঁরা এক টেবিলে কাজ করছেন তাঁদের টেবিল সরানো হবে। সেক্রেটারিয়েট এবং কেরাণীদেরও বদলি করা হচ্ছে। এঁরা সকলেই বামপন্থী সংগঠনের কর্মী।

সিপিএমের অবস্থা ভাল নয়। রেজ্জাকের "হজ যাত্রা" নিয়ে সিপিএমের রাজ্য-কমিটিতে প্রবল সমালোচনা উঠেছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন প্রমোদ দাশগুপ্ত-জ্যোতি বসুর জমানায় প্রাক্তন মন্ত্রী-স্পিকার মনসুর হবিবুল্লাহ-এর "হজযাত্রা" নিয়েও সমালোচনা উঠেছিল। শুধু হজযাত্রা নয়, দুর্গাপূজার অষ্টমীতে কুমারী পূজাতে প্রবীণ সিপিএম নেতা বিনয় চৌধুরী যোগ দিলে তাঁকেও তীব্র সমালোচনা করেছিলেন নবীন-প্রবীণ নেতারা। রেজ্জাক মোল্লা বলেছেন— ' কোন কোন নেতাদের বাড়িতে লক্ষ্মীপূজা বা কালীপূজা হয় তা বলে দোব।'

এখন পার্টিতে একে অপরের দোষ খুঁজতে ব্যস্ত। পার্টিকে পুনরুজ্জীবিত করতে সম্পূর্ণরূপে সিপিএমের সকল স্তরের নেতারা ব্যর্থ।

এদিকে ভাড়া বাড়াবে না বলে গোঁ ধরে থাকার পর বাস মালিকদের কাছে আত্মসমর্পণ করে বাসভাড়া বাড়ানো হলো ভীষণভাবে। একদিকে কিলোমিটার কমানো হলো আবার ভাড়াও বাড়ালো। ৬ টাকার ভাড়া ৯ টাকা হলো। দূরপাল্লার বাসে ৭৫ শতাংশ ভাড়া বেড়েছে। লোকের ক্ষোভ বাড়ছে— যে কোনও সময়ে ক্ষোভের অনল জ্বলে উঠতে পারে?

দুর্নীতির উৎস সন্ধানে

আম-আদমি বছরে ৪ লক্ষ কোটি টাকা ঘুষ দেয় নেতাদের

তারক সাহা

লবণকে আরও বেশি লবণাক্ত করার যেমন দরকার হয় না বা নিউ ক্যাসেলে যেমন কয়লা নিয়ে যাবার দরকার নেই, তেমনি আমাদের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাবাবুদের দুর্নীতি ছেড়ে সৎ, সাধু হবার পরামর্শ দেওয়ারও প্রয়োজন নেই। সরকারি আয়কর দপ্তর প্রায়শই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আম-আদমিকে জ্ঞান দেয় দূরদর্শনের পর্দায়। এমনই এক বিজ্ঞাপনে কেতাদুরস্ত এক সৎ, তরতাজা যুবক তার বাবাকে পরামর্শ দিচ্ছে যে, তার বাবা যেন সঠিক সময়ে সরকারের কর বাবদ পাওনা টাকা মিটিয়ে দেয়, কারণ ওই টাকা সরকার বাহাদুর দেশের বুনিয়াদ গড়তে খরচ করবে। এই বুনিয়াদী খরচের মধ্যে থাকবে হাসপাতাল নির্মাণ, দুঃস্থ-অনাথদের মিড-ডে মিল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, দেশের রাস্তা-ঘাট তৈরি। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে এমনই এক, কোনও নেতাবাবুর ছেলেমেয়ে তো কই তাদের বাবাকে পরামর্শ দিচ্ছে না তারা যেন সৎ হয়, কিংবা উৎকোচ গ্রহণ না করে।

প্রতিদিনই প্রায় দেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে দুর্নীতির খবর ফলাও করে প্রকাশিত হচ্ছে। দুর্নীতির দায়ে জড়িয়ে পড়ছে দেশের তাবড় নেতা-বাবুরা। আর এই ভার প্রতিনিয়ত বহন করে চলেছে দেশের অর্থনীতির সবচেয়ে বড় শরিক মধ্যবিত্ত বর্গ। মূল্যসূচক বৃদ্ধির হার, গ্যাস, বিদ্যুতের মতো বুনিয়াদী নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি ক্রমাগত আকাশ ছোঁয়া এবং সেই সঙ্গে দুর্নীতির পারদও চড়ছে সমহারে। এসব কিছু নিয়ে সুর চড়িয়েছেন আন্না হাজারে, বাবা রামদেবের মতো ব্যক্তিরা। কিন্তু আম-আদমির কষ্টের লাঘব হচ্ছে কই? এত হৈ-হট্টগোলের পরও বিদেশে জমা কালোটাকা দেশে ফিরিয়ে আনার সবরকম চেষ্টাকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে সরকার।

সারা দেশজুড়ে বছরে কীভাবে আম-আদমি নেতাবাবুদের উৎকোচের বায়নাক্কা মেটায় তারই আলোচনা করব এই প্রতিবেদনে। আমরা সাধারণ মানুষরা বিভিন্ন সরকারি কাজ পেতে গেলে আমলা, নেতা থেকে শুরু করে একেবারে কেরাণী চাপরাশি স্তর পর্যন্ত বছরে প্রায় ৪ লক্ষ কোটি টাকা ‘ঘুষ’ দিয়ে থাকি। এই পরিমাণ টাকা জাতীয় গড় উৎপাদনের ৬ শতাংশ। প্রতি বছরে এই বিপুল অর্থের জোগান হচ্ছে ভারতীয় অর্থনীতিতে ‘কালো টাকা’ হিসেবে। অথচ সরকারি হিসেবে ২০১২-১৩ বাজেটে বাজেট ঘাটতি দেখানো হয়েছে জাতীয় গড় উৎপাদনের মাত্রার ৬.১ শতাংশ। অর্থাৎ এই পরিমাণ অর্থ দেশের রাজকোষে ঢুকলে ডিজেল-পেট্রল থেকে শুরু করে রান্নার গ্যাসের দাম যে দ্বিগুণ দিতে হচ্ছে বা হবে তা দিতে হোত না।

এর অর্থ হলো আর্থিক দিক থেকে আরও দুর্বল হচ্ছে সাধারণ মানুষ বিশেষতঃ বিপুল মধ্যবিত্ত সমাজ। এছাড়া যদি বড় বড় দুর্নীতি যেমন ২-জি কেলেঙ্কারি, কয়লা কেলেঙ্কারি বা বিমান বন্দর জমির কেলেঙ্কারির মতো বড়-মেজ-ছোট মাপের কেলেঙ্কারিগুলির হিসেব জুড়লে তা জাতীয় গড় উৎপাদনের ১২ থেকে ১৪ শতাংশে পৌঁছে যাবে বা যাচ্ছে।

কিন্তু বিষয়টা নিয়ে কখনওই জনসমক্ষে খোলাখুলি আলোচনা হয় না। বড় বড় ব্যবসায়ীরা এ নিয়ে মুখ খোলেনই না। কারণ সরকারি অনুগ্রহ পেতে উৎকোচ প্রদান খুবই দরকারি। সামান্য কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে যদি কোটি কোটি টাকার বরাত পাওয়া যায় তার ফায়দা তুলতে সচেষ্ট দেশের সব বণিকমহলই। তাই এরা সংস্কারপন্থী। সরকারকে আরও বেশি সংস্কার প্রক্রিয়া গ্রহণ করার জন্য পরামর্শ ও চাপ দুই-ই দিয়ে থাকে। আর এদের পাপের বোঝা বহন করে চলেছে তামাম মধ্যবিত্ত সমাজ।

দেশের গরীব-গুর্বোরা-ই সরকারি ছোট-খাটো কর্মচারীদের পকেট ভরায় বেশি। আনুমানিক সারাদেশে এই গরীবদেরই দৈনিক আয়ের দশ শতাংশ যায় এইসব কর্মচারীদের পকেটে। বেকার সমস্যায় জর্জরিত এই দেশে বেকাররা ছোট-খাটো পুঁজি জোগাড় করে ফুটপাথে বসে উপার্জন করে। বড় শহরে বিশেষত, কলকাতার ফুটপাথ আর পথচারীদের জন্য নির্দিষ্ট নয়। এই ফুটপাথগুলিতে ভরপুর ব্যবসা চালাচ্ছে বেকাররা। তাদের আয়ের দশ শতাংশ ‘তোলা-র’ নামে স্থানীয় থানায় জমা পড়ে। আর তার অংশীদারিত্বে সামিল থানায় বড়-মেজ-সেজ সব বাবুরাই।

অন্যান্য সরকারি কর্মীরা তারা তাদের উপার্জন দুভাগে ভাগ করে নিয়েছে। একভাগ হলো ‘সরকারি অ্যাকাউন্ট’— যা হলো মাসিক বেতন। এর ওপর সরকার কর আদায় করে। অপর অ্যাকাউন্ট হলো ‘ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট’ বা ‘পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট’। এই ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট উপার্জিত অর্থের ওপর কর দিতে হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই উপার্জন তাদের বেতনের থেকে বেশি হয়।

তামিলনাড়ুতে রেজিস্ট্রারের অফিসে এক

অভিনব পদ্ধতিতে উৎকোচ গ্রহণ করে সেখানকার কর্মীরা। এরা পকেটের পয়সা খরচ করে 'উৎকোচ গ্রহীতা' (Tax Collector) নিয়োগ করেছে। এরা কর্মীদের হয়ে 'ঘুষ' সংগ্রহ করে আর কখনও যদি এরা ধরা পড়ে তো এদের দায় নেয় না ওইসব কর্মী।

দেশের দুর্নীতি এতটাই গভীরভাবে প্রোথিত হয়েছে যে, কোনও শিশুর জন্ম-পঞ্জী (Birth Certificate) বের করতে এক হাজার টাকা বা ততোধিক পয়সা খরচ করতে হয় শিশুটির পিতামাতাদের, কিংবা মৃত্যু-পঞ্জী (Death Certificate) বের করতে কর্মীদের হাত তৈলাক্ত করতে মৃত বা মৃতার পরিজনদের হাজার হাজার টাকা ব্যয় করতে হয়। আর যদি কর্মীরা বোঝে যে এই মৃত বা মৃতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কোনও বড় টাকার সম্পত্তির লেন-দেন তবে তো আর কথাই নেই।

সম্প্রতি বেঙ্গালুরুতে সরকারি হাসপাতালের এক কর্মী এক নবজাতকের পরিজনের কাছ থেকে 'সার্ভিস ট্যাক্স' নিয়েছে এমন সংবাদ মিডিয়ার প্রচার হতেই দেশজুড়ে তোলপাড় হয়ে যায়।

এসব ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যও বিচার্য বিষয়। পুত্র সন্তানের ক্ষেত্রে এই উৎকোচের পরিমাণ ৩০০ টাকা আর কন্যাসন্তানের ক্ষেত্রে ২০০ টাকা।

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ২০১০-১১ আর্থিক বছরে সরকারি অফিসে কাজের দিন ২৫০ ধরে দেশের কোনও এক বড় শহরে কমপক্ষে ২ হাজার কোটি টাকা লেন-দেন হয়ে থাকে। দেশের এমন ৫০টা শহরের গড় হিসেবে এই আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ লক্ষ কোটি টাকার। ওই আর্থিক বছরে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি কর বাবদ মোট আয় করেছে ১২ লক্ষ ৩৭ হাজার ৩৪৪ কোটি টাকা। যদি মোটামুটি হিসেব করা যায় তাতে দেখা যাচ্ছে যে, সবই ঠিকঠাক দিলে সরকারের আয় হোত ১৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ৬৮০ কোটি টাকা। অর্থাৎ ৩ লক্ষ ৯ হাজার ৩৩৬ কোটি টাকা সরকার কম আয় করেছে স্রেফ ঘুষের কারণে। সরকারি এই কম রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে যদি ১ লক্ষ কোটি টাকা ঘুষের অর্থ (এই হিসেব কেবল দেশের ৫০টি বড় শহরের ওপর) যোগ করলে এই 'উৎকোচে কর' দাঁড়ায় ৪ লক্ষ ৯ হাজার ৩৩৬ কোটি টাকা। এই আর্থিক বর্ষে (২০১০-১১) গড় জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৭৬ লক্ষ ৭৪ হাজার ১৪৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ উৎকোচ কর হলো এই উৎপাদনের ৬ শতাংশেরও বেশি।

এর মধ্যে অবশ্য সরকারি বিভিন্ন চুক্তিতে সরকারি কর্মীরা যে ঘুষ আদায় করে থাকে তা ধরা হয়নি। প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কেনায় যে পরিমাণ কালো টাকা লেনদেন হয়ে থাকে তা এর মধ্যে ধরা নেই, এইভাবে সারাদেশে গড় জাতীয় উৎপাদনে ১২ শতাংশ অর্থ উৎকোচের আকারে আদায় হয়ে থাকে। অথচ দেশের কর ও গড় জাতীয় আয়ের অনুপাত হলো ১৬ শতাংশ।

এর অর্থ হলো 'উৎকোচ কর' ও 'নিয়মত করের' সামগ্রিক অনুপাত হলো ৩০ শতাংশ। এই বিপুল অর্থে অনেক উন্নত দেশেরই বাজেট হয়ে যায়। আমরা তবে বলতে পারি যে, আমাদের দেশের প্রকৃত আদায় গড় জাতীয় উৎপাদনের ৩০ শতাংশ হলেও সরকারি রাজকোষে জমা পড়ে এর ঠিক অর্ধেক।

এই 'উৎকোচ করের' জন্যই দেশের বড় বড় সরকারি পদগুলির নিয়োগে কার্যতঃ নিলামের ব্যবস্থা করেছে আমাদের রাজনৈতিক প্রভুরা। বলার দরকার নেই যে, এই উৎকোচ কাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সব রাজনৈতিক দলের বড়-ছোট নেতারা।

> **বিভিন্ন সরকারি কাজ পেতে গেলে আমলা, নেতা থেকে শুরু করে একেবারে কেরাণী চাপরাশি স্তর পর্যন্ত বছরে প্রায় ৪ লক্ষ কোটি টাকা 'ঘুষ' দিয়ে থাকি। এই পরিমাণ টাকা জাতীয় গড় উৎপাদনের ৬ শতাংশ। প্রতি বছরে এই বিপুল অর্থের জোগান হচ্ছে ভারতীয় অর্থনীতিতে 'কালো টাকা' হিসেবে।**

অসংগঠিত ঋণ বাজারে বিপুল পরিমাণে এই অর্থ খাটে। দেশের অর্থনীতিতে এই বিপুল কালো টাকার জোগানের এক সুদূর প্রসারী ফল রয়েছে।

দুর্নীতির এই ফসল বিদেশের ব্যাঙ্কে সুরক্ষিত। আবার এই অর্থ-ই প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ হিসেবে দেশে ফিরে আসছে। যার পরিণামে আমরা দেখছি ২-জি, কোলগেট কেলেঙ্কারির মতো বড় বড় আর্থিক দুর্নীতি। আর এই ঘুষ, চুরি, ঠগীদের অর্থের বিরুদ্ধে যখনই বিরোধী কণ্ঠের আওয়াজ উঠছে তখনই তাকে সরকার দমিয়ে দিচ্ছে সিবিআই, এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরের জুজুর ভয় দেখিয়ে।

(তথ্য সূত্র : "স্বদেশী পত্রিকা")

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজা

উজ্জ্বলকুমার মণ্ডল

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মুঙ্গের থেকে গঙ্গাবক্ষে কৃষ্ণনগরে ফিরছেন। মনোরম শরতের প্রকৃতি। গঙ্গার দুই তীরের প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্য অপরূপ। মৃদু হাওয়া বইছে। কাশ দুলছে। নির্মল, বৃষ্টি-ধোয়া আকাশে ভাসছে সাদা মেঘের ভেলা। এমন প্রকৃতির মাঝে স্বভাবত মন শান্ত হয় এবং শান্তি পায়। কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মনে সুখ নেই। প্রকৃতির শ্যামশোভা তাঁকে ব্যথিত করে। বঙ্গে সদ্য শারদীয় উৎসব শেষ হয়ে গেছে। মাতৃপূজার এই পরম লগ্নে তিনি মুঙ্গেরে নবাব মীরকাশিমের দুর্গে বন্দি হয়ে রইলেন। মীর কাশিমের কাছে খাজনা দিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু খাজনা কম পড়ায় মীরকাশিম তাঁকে কারাকক্ষে অবরুদ্ধ রাখেন।

মহারাজার মন তাই ভারাক্রান্ত। মহামায়ার আরাধনায় অংশ নিতে না পারার আক্ষেপ। গ্লানি আর অবসাদের মধ্যে এক সময় তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

মহারাজের নিদ্রিতাবস্থায় আবির্ভূত হলেন এক দেবী। দেবী তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন, দুঃখ করতে নিষেধ করলেন। তিনি এবার তাঁর প্রাসাদে আসবেন জগদ্ধাত্রী রূপে। একমাস পর কার্তিক মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে পূজা নেবেন। কৃষ্ণচন্দ্রের মাধ্যমে কৃষ্ণনগরে তথা বঙ্গদেশে এইভাবে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন হলো। অবশ্য, গবেষকদের মতে, ভারতবর্ষে কনৌজের অধিপতি রাজ্যবর্ধন সর্বপ্রথম জগদ্ধাত্রী পূজার আয়োজন করেন।

এ হচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। কৃষ্ণনগরে যেমন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তেমনি চন্দননগর অঞ্চলের ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এক স্বনামখ্যাত ব্যক্তিত্ব। তিনি ফরাসি চন্দননগরের দেওয়ান। শুধু চন্দননগর কেন, সম্পদে এবং সম্ভ্রমে তৎকালীন বঙ্গদেশের এক সুসন্তান। কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর হৃদ্য সম্পর্কও ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর কাছে আসতেন, তিনিও যেতেন কৃষ্ণনগরে। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বিড়ম্বিত অবস্থায় জীবিকার সন্ধানে ইন্দ্রনারায়ণের কাছে এসেছিলেন। তাঁরই সুপারিশে কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে সভাকবি করে নেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের সংস্পর্শে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী দেবী জগদ্ধাত্রী সম্পর্কে অবহিত হন এবং চন্দননগরে অনুরূপ পূজা প্রবর্তনের জন্য অনুপ্রাণিত হন। আনুমানিক ১৭৬৩ খৃস্টাব্দে চন্দননগরের লক্ষ্মীগঞ্জ বাজারের চাউলপট্টিতে দেবী জগদ্ধাত্রী পূজিত হলেন। কৃষ্ণনগরে কৃষ্ণচন্দ্র এবং চন্দননগরে দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এই পূজার প্রথম আয়োজক। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে— কে এই জগদ্ধাত্রী। সাধারণ ভাবে বলা যায় জগৎকে যিনি ধারণ করে আছেন তিনিই জগদ্ধাত্রী। তিনিই ভিন্ন রূপে কালী, দুর্গা, বিচিত্র রূপ-রূপান্তরধারিণী সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় বিধাত্রী পরমা প্রকৃতি মহামায়া মহাদেবী। 'দেবী ভাগবতে'র ভাষায় :

সেয়ং শক্তিমহামায়া সচ্চিদানন্দরূপিণী।
রূপং বিভর্ত্যরূপা চ ভক্তানুগ্রহহেতবে।।

সেই এই মহামায়াশক্তি সচ্চিদানন্দ-রূপিণী অরূপা হয়েও ভক্তকে অনুগ্রহ করবার জন্য বিশেষভাবে রূপ ধারণ করেন।

মহামহোপাধ্যায় মুরারিমোহন বেদান্তাদিতীর্থ শাস্ত্রীর কথায়, ত্রেতা যুগে দেবতারা আকাশে ভীষণ প্রজ্জ্বলিত এক অগ্নিগোলক দেখতে পান। আকস্মিক এই অগ্নিগোলকের আবির্ভাবে দেবকুল যারপরনাই আশঙ্কিত হয়ে প্রমাদ গুণতে শুরু করলেন। স্বর্গরাজ্য কি তবে বিপন্ন? দেবরাজ ইন্দ্র অগ্নিদেবকে আদেশ করলেন, তাঁর আগ্নেয় শক্তির সাহায্যে ওই অগ্নিগোলককে দুর্বল করে দিতে। অগ্নিদেব গর্বভরে অগ্রসর হলেন, কিন্তু সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও সেই অগ্নিগোলকের জ্যোতি অনুমাত্র হ্রাস করতে পারলেন না, বরং সেই মহাশক্তির সম্মুখে নিজের ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করে হতমান চিত্তে ভীরু পদক্ষেপে ফিরে এলেন।

এবার পবনদেবের পালা। অগ্নির মতো প্রবল পরাক্রমে তিনিও ধেয়ে গেলেন। কিন্তু

অগ্নিদেবের ন্যায় তাঁর পরিণামও শোচনীয় হলো। সেই মহাশক্তিকে উড়িয়ে দেওয়া দূরের কথা, এক গুচ্ছ শুষ্ক তৃণ-কে নড়াতে পারলেন না। পর্যুদস্ত পবনদেব অধোবদনে ফিরে এলেন দেবসভায়। তখন, দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে সমস্ত দেবতা সমবেত ভাবে ভক্তিনত চিত্তে সেই মহাশক্তির উদ্দেশে প্রণাম জানালেন। এই মহাশক্তিই জগদ্ধাত্রী। দেবীর আবির্ভাব প্রথমে দেবতারা মেনে নেন, পরে মুনি-ঋষিদের মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে দেবীর পূজার প্রচলন ঘটে। দেবতা আর অসুর একই পিতার সন্তান। কিন্তু উভয়ের মধ্যে নিত্য দ্বন্দ্ব। দেবতারা নিজের প্রতাপ ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে অন্য বিরুদ্ধশক্তিকে খর্ব করতেন নিজেদের অমরত্ব শক্তির সাহায্যে। মহাদেব দেবতাদের ক্ষমতার এই একাধিপত্য পছন্দ করতেন না। তাই তিনি এক একসময় সৃষ্টি করতেন মহাপরাক্রমশালী দেবতাদের প্রতিস্পর্ধী কোনও অসুর। এই রকম এক সৃষ্টি করীঙ্গাসুর। কিন্তু অন্যান্য অসুরের মতো করীঙ্গাসুরও ক্ষমতার দর্পে অন্ধ হলেন। নিজেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর ভাবতে লাগলেন। তাঁকে বিনাশ করার জন্য জগদ্ধাত্রীর আবির্ভাব। সত্য যুগে দুর্গা, ত্রেতায় জগদ্ধাত্রী। উভয়ের পূজা পদ্ধতিতে মিল থাকলেও অমিলও আছে। দুর্গা পূজা হয় বৈদিক মতে, জগদ্ধাত্রী পূজা হয় তান্ত্রিক রীতিতে। মুরারিমোহন বেদান্তাদিতীর্থ শাস্ত্রীর মতে, এ পূজা একদিনে হওয়া উচিত। কার্তিক মাসে শুক্লা নবমী তিথিতে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পূজা সূচিত হয়ে একে একে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে চলে। পূজার কল্পারম্ভ থেকে সন্ধ্যায় হোম যজ্ঞাদি ক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত মলমূত্রাদি ত্যাগ

করা চলে না। তাই অত্যন্ত কঠিন এই পূজা। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী প্রত্যেক পূজায় পৃথকভাবে ভোগ নিবেদন করাই বিধি। এক পূজায় যে ভোগ নিবেদন করা হয় সে সমস্ত দ্রব্য ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে পরবর্তী পূজার আয়োজন করা হয়। প্রত্যেক পূজায় আলাদাভাবে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয়। প্রত্যেক পূজায় পৃথকভাবে সম্পন্ন হয় হোম-যজ্ঞ-বলিদান। শাস্ত্রানুযায়ী, দেবীর গাত্রবর্ণ নবোদিত সূর্যের ন্যায় আরক্তিম। দেবীর চার হাতে শঙ্খ, চক্র, পদ্ম ও ধনুক। অশুভ, আসুরিক শক্তিকে পরাহত করার জন্য দেবীর বাহন সিংহ। সিংহের পদতলে পিষ্ট হাতি। এই হাতি-ই করীঙ্গাসুর।

চন্দননগরে যে স্থানে দেবীর প্রথম পূজা চালু হয় সেই স্থানটি 'চাউলপট্টি' বা 'নীচে পট্টি' নামে পরিচিত। এই পূজা আজও চলে আসছে। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বংশধরগণের নামে পূজার সংকল্পাদিও হয়ে আসছে।

পূজা প্রবর্তনের পর খুব দ্রুত চন্দননগর এবং আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে এবং জনপ্রিয়তা পায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পূজার সংখ্যাও বাড়তে থাকে। ফলত, জৌলুসে, আড়ম্বরে, সংখ্যায় কৃষ্ণনগরকে ছাড়িয়ে যায় চন্দননগর। তাছাড়া, জগদ্ধাত্রী পূজা শুধু চন্দননগরেই নয়, কাছের শহর ভদ্রেশ্বর, এমনকি একটু দূরের রিষড়াতেও ছড়িয়ে পড়ে। স্বাধীনতার পূর্বে যেখানে ২৫-৩০টি পূজা হোত, সেখানে এখন ১৪০ এবং ভদ্রেশ্বরে ৩৫টি পূজা কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে হয়, এছাড়াও ২০-২২টি পূজা সম্পন্ন হয়। প্রাচীন পূজার মধ্যে লক্ষ্মীগঞ্জ চাউলপট্টি, কাপড়পট্টি, তেঁতুলতলা, ভদ্রেশ্বরগঞ্জ ২০০ বছর অতিক্রম করেছে, বাগবাজার ১৭৫ বছর পার করেছে। মহাসমারোহে পূজা হয় হেলাপুকুর, বিদ্যালঙ্কা, ফটক গোড়া, খলিসানী, তেমাথা, নতুনপাড়া, অম্বিকা অ্যাথলেটিক ক্লাব, গোন্দলপাড়া, মনসাতলা, চারমন্দিরতলা বিভিন্ন স্থানে।

প্রাচীন চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজার এক মনোজ্ঞ চিত্র পাওয়া যায় হরিহর শেঠের 'সংক্ষিপ্ত চন্দননগর পরিচয়' গ্রন্থে...''ইহা এখানকার একটি বিশিষ্ট বাৎসরিক উৎসব। চারদিন ধরিয়া বিভিন্ন পল্লীতে ২০/২২ খানি বৃহদাকার প্রতিমা পূজিত হইয়া থাকে।...এতদুপলক্ষে কয়েক স্থানে দিবসত্রয় যাত্রা, থিয়েটার, প্রদর্শনী, দরিদ্রগণকে অন্নবিতরণ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়।'' সুধীরকুমার মিত্রর 'হুগলি জেলার ইতিহাস' গ্রন্থ থেকেও জানা যায়, পূজা উপলক্ষে যাত্রা, পুতুলনাচ, সার্কাস, তরজাগান, খেমটা নাচ ইত্যাদি আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হোত। রাস্তার দুই ধারে মেলা বসে যেত।

শুধু পূজার সংখ্যা নয়, জাঁকজমকও বেড়ে গেছে প্রবলভাবে। প্রতিমা, আলোকসজ্জা, দামি মণ্ডপ, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার টানে চন্দননগরবাসীর সঙ্গে দূর-দূরান্তের মানুষও এই উৎসবে সামিল হয়। বিশেষ করে উত্তর চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, কলকাতা, হাওড়া, বর্ধমানের বিভিন্ন

জায়গা থেকে ট্রেনে, বাসে, রিজার্ভ গাড়িতে মানুষ এখানে আসে। ছিমছাম শহর চন্দননগর জনসমুদ্রের রূপ নেয়।

তবে বাইরের চোখ ধাঁধানো জাঁকজমক এবং আড়ম্বর থাকলেও পূজার প্রধান শর্ত যে ভক্তি আর নিষ্ঠা তা আজও চন্দননগর থেকে উধাও হয়ে যায়নি। শুধু পারিবারিক পূজা প্রাঙ্গণেই নয়, সর্বজনীন বারোয়ারি পূজামণ্ডপেও থাকে এক নৈতিক পরিবেশ।

ধূপধুনো, ঢাকঢোল, কাঁসর ঘণ্টার ধ্বনিতে শুচিস্নিগ্ধ মনোরম উৎসবের আমেজ। সর্বজনীন বারোয়ারি পূজার মধ্যে এক পারিবারিক চেহারা লক্ষ্য করা যায়। পূজাকে ঘিরে সমস্ত পল্লীর সমস্ত পরিবারের অংশগ্রহণের জন্য চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজা যথা অর্থে সর্বজনীন হয়ে ওঠে যা অন্যত্র বিরল। পূজার চারদিন বিভিন্ন দায়িত্ব সকলেই ভাগ করে নেন। আজ যখন চারদিকে বারোয়ারি পূজাকে ঘিরে ভক্তিহীন কৃত্রিমতা, ঐশ্বর্য দেখানোর প্রতিযোগিতা, তখন চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজা বাহ্য আড়ম্বর থাকা সত্ত্বেও মানুষের আন্তরিকতার ছোঁয়ায় সুন্দর এবং স্বতন্ত্র।

চন্দননগরের সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী পূজা বৈদিকমতে চারদিন ধরে হলেও বাড়ির নিজস্ব পূজা সাধারণত হয় তন্ত্র মতে, শুধু নবমীর দিনে। যদিও এরকম পূজার সংখ্যা কম। প্রায় ২০-২২টি পরিবারে পারিবারিক ঐতিহ্য বজায় রেখে সাবেক সংস্কার অনুযায়ী পূজা হয়ে আসছে।

চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী প্রতিমারও প্রসিদ্ধি আছে। এখানে চালচিত্রসমেত ২০ থেকে ৩০ ফুট উচ্চতার প্রতিমা দেখা যায়, প্রস্থেও ১৫-২০ ফুট হয়ে থাকে। এমন বিশাল উচ্চতার প্রতিমা অন্য কোথাও দেখা যায় না। এমন প্রকাণ্ড ও নানা মনোহর সাজে সজ্জিত প্রতিমা কুমোরপাড়াতে নয়, তৈরি হয় জগদ্ধাত্রীতলাতেই। দুর্গা পূজার পরে পরেই শুরু হয় প্রতিমা তৈরির কাজ। কোনও কোনও বারোয়ারিতে লক্ষ্মীপূজার দিন কাঠামো পূজা হয়, অনেক জায়গায় তা হয় বিজয়াদশমীর দিনই। প্রতিমার বিশেষ আকর্ষণ শোলা শিল্প এবং ডাকের সাজ। বিভিন্ন অলঙ্কার, মুকুট, চালচিত্রে দেবী-মূর্তি বিমুগ্ধ করে দর্শনার্থীদের। সাজসজ্জা থেকে বাদ পড়ে না দেবীর বাহন পশুরাজ সিংহও। তার মস্তকেও শোভা পায় বিশাল, বিচিত্র মুকুট। শোলার সাজের জন্য কাটোয়ার কাছে বনকাপাসী গ্রামের মালাকার পরিবাররা আসেন; ডাকের সাজের জন্য নৈহাটি থেকেও আসেন অনেক শিল্পী।

মণ্ডপের গঠন মূলত থিম-নির্ভর। তাতে বাংলার পল্লীর সঙ্গে প্রাচীন রাজবাড়ির সহাবস্থান সার্থকতা পায় মণ্ডপশিল্পীর মুনশিয়ানার মহিমায়। কিন্তু চন্দননগর জাদু দেখায় তার আলোকসজ্জায়, যার খ্যাতি দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশেও ব্যাপ্ত। শিল্পীদের অসাধারণ দক্ষতায় টুনিবাল্বের দ্বারা মূর্ত হয়ে ওঠে দেশ-বিদেশের আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা থেকে সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের বেঁচে থাকার বিভিন্ন খণ্ডাংশ। প্রাবন্ধিক পিনাকপানি ঘোষের মতে, আজকের চন্দননগরের আলোকসজ্জার উৎস নিহিত আছে প্রাচীন ফরাসি চন্দননগরের গর্ভে। ফরাসি শাসন মুছে গেলেও তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় এই আলোক সাজে। ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে। বাস্তিল দুর্গ দখল করে ওইদিন প্রতিষ্ঠিত হয় প্রজাতন্ত্র। ওইদিনটি জাতীয় উৎসব হিসাবে উদ্‌যাপিত হয়। ফরাসি শাসিত চন্দননগরেও উৎসবের আয়োজন হোত। ফরাসি 'ফেত' fete অর্থ উৎসব, সাধারণ মানুষের উচ্চারণ বিকৃতিতে যা 'ফ্যাস্তা' নামে প্রচার পায়। 'ফেত' বা 'ফ্যাস্তা' যাইহোক, এই উৎসব উপলক্ষে শহরকে আলোকমালায় সাজানো হোত দারুণ সুন্দরভাবে। রাস্তার বসত আলোকস্তম্ভ, পোড়ানো হোত আতসবাজি, গঙ্গায় হোত নৌকা-বাইচ। পাড়ায় পাড়ায় মেলা, হরেক প্রতিযোগিতা। জগদ্ধাত্রী পূজা ঘিরে যখন সর্বজনীন উৎসবের সূচনা তখন ওই ফরাসি উৎসব 'ফ্যাস্তা'র অনুকরণে গ্রহণ করা হয় শহরকে আলোর সাজে সজ্জিত করার পরিকল্পনা। ফরাসি শাসন মুছে গেছে, কিন্তু বলা যায় তার রেশ রেখে গেছে প্রথম দিকে মশালের আলো, তারপর গ্যাসের আলো এবং বর্তমানের বৈদ্যুতিক আলোর সাজসজ্জার মধ্যে। চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজা চারদিনের আলোক-উৎসবও বটে। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় জ্বলে ওঠে আলো। রাস্তায় মানুষের ঢল নামে। ঘরবাড়ি ভরে ওঠে আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের আগমনে। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী দিনরাত শহর মুখরিত হয়ে ওঠে মানুষের ভিড়ে।

দশমীর সকাল থেকে শুরু হয় বিসর্জনের প্রস্তুতি। যখন লরি ছিল না, তখন প্রকাণ্ড প্রতিমাগুলিকে অধুনালুপ্ত ইঁটের পাঁজার সাঁওতালরা বয়ে নিয়ে যেত। এক একটি প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য ১০-১২ খানি বাঁশ এবং প্রায় ৮০-৯০ জন বাহকের দরকার হোত। এখন, বাহক ও গ্যাসের আলোর পরিবর্তে প্রতিমা লরিতে উঠিয়ে ও বৈদ্যুতিক আলোতে সুসজ্জিত করে শুরু হয় বিপুল সমারোহে শোভাযাত্রা। শহর ঘুরিয়ে গঙ্গাবক্ষে বিসর্জন দিতে রাত শেষ হয়ে ভোর হয়ে যায়।

দুর্গা পূজার মধ্য দিয়ে বাঙালির যে উৎসবের মরসুমের শুরু, জগদ্ধাত্রী পূজায় তার শেষ। কিন্তু শেষ কি মেনে নেওয়া যায়। তাই প্রার্থনা— 'পুনরাগমনায় চ'— আবার এসো মা!

জগদ্ধাত্রী পুজোর নিয়ম কানুন

নবকুমার ভট্টাচার্য

জগদ্ধাত্রী পুজো নিয়ে অনেকেই কিছুটা বিভ্রান্ত। এই পুজো করার নিয়ম শুধুমাত্র নবমী তিথিতেই, নাকি পুজো দুর্গাপুজোর মতো সপ্তমী অষ্টমী ও নবমী টানা তিনদিন ধরে? মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রবর্তন করা এই পুজো কোথাও কেবল নবমীতেই হচ্ছে আবার কোথাও হচ্ছে টানা তিনদিন ধরে অর্থাৎ দুর্গাপুজোর মতোই সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী জুড়ে।

বৃত্রাসুরের দাপটে একবার স্বর্গরাজ্য থরহরিকম্প। অসুরদের অত্যাচার থেকে স্বর্গের দেব সংস্কৃতি বাঁচাতে দেবরাজ ইন্দ্র ভেবে আকুল। কী করবেন? দেবতারা সবাই মিলে স্থির করলেন দেবী জগদ্ধাত্রীর আরাধনা করবেন। দেবী দুর্গার রূপভেদে জগদ্ধাত্রীর আরাধনা সেই প্রথম। কার্তিক মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে দেবী জগদ্ধাত্রীর আরাধনা করে দেবশত্রু বৃত্রাসুরকে বিনাশ করলেন দেবরাজ ইন্দ্র। চৈতন্য সমসাময়িক স্মার্ত রঘুনন্দন তাঁর 'দুর্গোৎসব তত্ত্বম্' গ্রন্থে শুক্লাকার্তিকী নবমী তিথিতে প্রাতে সাত্ত্বিকী, মধ্যাহ্নে রাজসিকী ও অপরাহ্ণে তামসিকী— এই ত্রৈকালিক পুজোর কথা বলেছেন। জগদ্ধাত্রী পুজোর বর্তমান রূপকার কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। তিনিও একদিনে নিষ্পাদ্য দুর্গাপুজো হিসেবেই স্বপ্নের দেখা জগদ্ধাত্রী মূর্তির পুজো করেন।

জগদ্ধাত্রী পুজোকে দুর্গাপুজোর নামান্তর বলা হলেও এই দুটি পুজোর মধ্যে মূল পার্থক্য হলো দুর্গাপুজো মহাপুজো এবং পুজোর আচার অনুষ্ঠান হয় পৌরাণিক মতে বৈদিক মন্ত্রে। কিন্তু জগদ্ধাত্রী পুজোকে সেই অর্থে মহাপুজো বলা চলে না। এর পুজোও হয় তন্ত্র মতে। স্মার্ত রঘুনন্দন বলছেন, জগদ্ধাত্রী পুজোর দুটি কল্প। তার মধ্যে প্রথম কল্প কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী এই তিন তিথিতে তিন পুজো এবং দশমীতে বিসর্জন। নিগমকল্পসার ও জ্ঞানসারস্বত গ্রন্থে এর প্রমাণ রয়েছে—

'অথান্যৎ সম্প্রবক্ষামি শৃণুষ্ব পরমেশ্বর
সপ্তম্যাদি নবম্যন্তঃ পূজাকালমিতীরিতম্।
ত্রিদিনে ত্রিবিধা পূজা দশম্যান্ত বিসর্জয়েৎ।'

অর্থাৎ হে মহেশ্বর! অন্য এক প্রকার পুজোর কথা বলছি শুনুন। সপ্তমী হতে নবমী পর্যন্ত তিন তিথি পুজোর কাল। ওই তিন তিথিতে তিন পুজো করবে এবং দশমীতে বিসর্জন করবে।

কার্তিকমাসের শুক্লপক্ষের নবমীতে যে পুজো করা হয় তা দ্বিতীয় কল্প। কুব্জিকাতন্ত্রে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— ধর্ম অর্থ ও কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের নবমীতে ভক্তিপূর্বক জগন্মাতা দুর্গার পুজো করবে।

''কার্তিকে শুক্লপক্ষে তু নবম্যাং জগদম্বিকাম্
দুর্গাং প্রপূজায়দ্ভক্ত্যা ধর্মকামার্থসিদ্ধয়ে।''

বলা হয়েছে— সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী এই তিন তিথিতে তিন পুজো করতে না পারলে একমাত্র নবমীতে জগদ্ধাত্রী পুজো করবে।

কার্তিকস্য মিতে পক্ষে নবম্যাং জগদীশ্বরম্
ত্রিকালমেককালং বা বর্ষে বর্ষে প্রপূজয়েৎ।

কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের নবমীতে পূর্বাহ্ণে মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্ণে জগদ্ধাত্রীপুজো হবে।

বিশেষ নিবন্ধ

বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী ও চীনা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব আর এস এসের

গত ২, ৩, ৪ নভেম্বর চেন্নাইতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডলের বৈঠক হয়ে গেল। সেই বৈঠকে দেশের সমস্ত প্রদেশ থেকে সঙ্ঘের প্রাদেশিক ও তদূর্ধ্ব কার্যকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত এই বৈঠকে পুরো সময় উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত দুটি প্রস্তাব এখানে পুরোপুরি প্রকাশ করা হলো।

।। প্রস্তাব : ১ ।।

অসমের হিংসা ও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের দেশব্যাপী বিপদ

জুলাই ২০১২, অসমের কোকরাঝাড়, চিরাংগ তথা ধুবড়ি জেলায় বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের কারণে উৎপন্ন অশান্তি এবং তার পরবর্তীতে দেশের বিভিন্ন শহরে হিংসাত্মক ঘটনা তথা দেশের বিভিন্ন ভাগে শান্তিতে বসবাসকারী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের মধ্যে যড়যন্ত্রপূর্বক ভয় ও আতঙ্ক ছড়িয়ে তাদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করার মতো অপকর্মকে অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল ঘোর নিন্দা করছে। এই সমস্ত ঘটনা দেশের মধ্যে এক ভয়াবহ বিপদ বলে কার্যকরী মণ্ডল মনে করে। অসম ও নিকটবর্তী অঞ্চলে অবিরত অনুপ্রবেশের কারণে এক গম্ভীর ও সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

২০০৩ সালে কেন্দ্র সরকার এবং অসম সরকারের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে তৈরি হওয়া বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল এরিয়া ডিস্ট্রিক্ট (বি টি এ ডি)-এর চারটি জেলাতে বিপুল সংখ্যক অনুপ্রবেশকারী বসবাস করছে। এদের কারণে এখানকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রাকৃতিক, আর্থিক, ধার্মিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশের উপর সুদূরপ্রসারী কু-ফল পরিলক্ষিত হয়েছে। বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল (বি টি সি)-তে সংরক্ষণের দাবিতে মুসলমানরা গত ২৯ মে ‘বন্‌ধ’ ঘোষণা করে। দেশের কয়েকটি রাজনৈতিক দলের মুসলিম সংরক্ষণের অসাংবিধানিক ঘোষণা আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ করেছে। গত ২০ জুলাই মুসলমানদের দ্বারা চারজন বোড়ো যুবকের নির্মম হত্যার ঘটনায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। পরবর্তী হিংসাত্মক ঘটনায় সরকারি হিসাবে ৯০ জনের মৃত্যু ঘটে ও চার লক্ষের বেশি মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে ত্রাণশিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করে। ত্রাণশিবিরগুলিতে আশ্রয় নেওয়া বিপুল সংখ্যক অনুপ্রবেশকারীকে খুঁজে দেশের বাইরে পাঠানো অত্যন্ত জরুরি। এই কাজে অসমের অনেক জনসংগঠনের এক মঞ্চে এসে ‘অনুপ্রবেশকারীদের এদেশে কোনও স্থান নেই’— এই সামূহিক সংকল্প গ্রহণ প্রশংসনীয়।

প্রকৃতপক্ষে কায়েমী স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক দল এবং মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের প্রতি সাম্প্রদায়িক সহানুভূতিসম্পন্ন স্থানীয় মানুষের অনৈতিক সহযোগ ও সমর্থনের কারণে অনুপ্রবেশকারী মুসলমানরা এখানে জমি, জঙ্গল অথবা রোজগারের বিভিন্ন মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়ে স্থানীয় রাজনীতিতে নিজেদের অধিকার কায়েম করেছে। অনুপ্রবেশকারীদের সহযোগিতা ও সমর্থন যারা করছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল অসমের ঘটনাকে বিশেষ করে ‘বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী’ বিষয়টিকে একটি মুসলমানদের বিষয় হিসাবে তুলে ধরার নিন্দা করছে। সংসদের ভিতরে ও বাইরে কয়েকজন নেতার উত্তেজক বক্তব্য মুসলিম সমাজের মধ্যে নতুন করে উত্তেজনার সৃষ্টি করছে। কেবলমাত্র মুসলিম সাংসদদের বাছাইকরা কয়েকটি শিবির পরিদর্শন এবং ‘স্থানীয় ও বিদেশী’ নাম দিয়ে বিষয়টিকে সাম্প্রদায়িক রং দেবার চেষ্টাকে প্রতিটি জাতীয়তাবাদী ব্যক্তির নিন্দা করা উচিত।

অসমের ঘটনাকে নিয়ে মুম্বই, লখনউ, কানপুর, বেরেলী, আহমেদাবাদ, যোধপুর প্রভৃতি স্থানে মুসলিম কট্টরপন্থীদের দ্বারা পূর্বপরিকল্পিত উগ্র হিংসার প্রদর্শন দেশের সাধারণ মানুষকে চিন্তায় ফেলেছে। মুম্বাইয়ে হিংস্র জনতা কেবলমাত্র সংবাদ মাধ্যম বা সাধারণ নাগরিকদের আক্রমণই নয়, পুলিশের অস্ত্র লুঠ, রাষ্ট্রীয় স্মারকের অসম্মান ও তা নষ্ট করার মতো দুঃসাহসিক কাজও করেছে। এমনকি মহিলা পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে অসভ্য দুর্ব্যবহার করেছে। আরও চিন্তার বিষয় হল, প্রশাসনের কাছে এই ঘটনার কোনও আগাম তথ্যই ছিল না, আবার ঘটনা ঘটার পরও দোষী ব্যক্তিদের খুঁজে বার করে তাদের বিরুদ্ধে উচিত ব্যবস্থা গ্রহণের কোনও ইচ্ছাই এখনও নেই। অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল এই সমস্ত ঘটনার ঘোর ভর্ৎসনা করছে।

এই পর্যায়ে রাষ্ট্রদ্রোহী শক্তি দেশের বিভিন্ন অংশে বসবাসকারী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে বিভিন্ন মাধ্যমে

ভয় দেখানো শুরু করে দেয় যে, রমজানের পরেই তাদের উপর বদলা নেওয়া শুরু হবে। পরিণামে পুণে, ব্যাঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, চেন্নাই ইত্যাদি স্থান থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ নিজের রাজ্যে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় ভাবনা ও একাত্মতা রক্ষায় নিজ কর্তব্যের পরিচয় দিতে স্থানে স্থানে হাজার হাজার দেশভক্ত এগিয়ে আসে। আতঙ্কিত মানুষের কাছে সর্বপ্রকার সুরক্ষা ও সাহায্য দেওয়া ছাড়াও তাদের নিজের স্থান ছেড়ে না যাবার জন্য আগ্রহ করে। এই কারণেই ভয়ের এই ঢেউ দেশের অন্য স্থানে পৌঁছাতে পারেনি। অন্যদিকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের মধ্যেও আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল সেই সমস্ত দেশবাসীর অকুণ্ঠ প্রশংসা করছে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষদের আশ্বাস দিচ্ছে যে, দেশের জনতা তাদের সঙ্গেই রয়েছে। অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে যে, এই ভয়ের পরিবেশ নির্মাণকারী রাষ্ট্রবিরোধী শক্তিগুলিকে খুঁজে বার করে কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক।

অনুপ্রবেশকে সাহায্যকারী আই এম ডি টি (Illegal Migrant Determination by Tribunals) অ্যাক্ট ১৯৮৩-কে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় দ্বারা অবৈধ ঘোষণা এবং দিল্লী ও গৌহাটি উচ্চ ন্যায়ালয় দ্বারা অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে দেশের বাইরে বার করার নির্দেশ এবং বিশিষ্ট অধিকারীদের দ্বারা বারবার সমস্যার গভীরতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের পরও কেন্দ্র ও বেশ কয়েকটি রাজ্য সরকার ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির কারণে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছে। এই বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা আজ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। জনসংখ্যা বিন্যাসের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই অনুপ্রবেশকারীরা বিভিন্ন প্রকার অবৈধ ও আপত্তিজনক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হয়ে দেশের সুরক্ষার ক্ষেত্রে এক ভয়ানক সঙ্কটের সৃষ্টি করছে। জাল নোট, অবৈধ অস্ত্রের ব্যবসা, নেশার বস্তু ও গরু পাচার সহ অন্যান্য অপরাধমূলক কাজকর্মে লিপ্ত এই লোকগুলি আই এস আই এজেন্ট হিসাবেও কাজ করে। অখিল ভারতীয় কার্যকারী মণ্ডল কেন্দ্র সরকার তথা সমস্ত রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে, বিদেশী নাগরিক অধিনিয়ম ১৯৪৬ (Foreigners Act. 1946) অনুসারে তথা সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় ও বিভিন্ন উচ্চ আদালতের আদেশ অনুসারে সম্পূর্ণ দেশে নিপুণভাবে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে তাদের এদেশের প্রাপ্ত নাগরিক অধিকার হরণ করে অবিলম্বে বহিষ্কার করা হোক। যে সমস্ত অনুপ্রবেশকারী নিজেদের নাম ভোটার তালিকাভুক্ত করেছে, অবিলম্বে সেই নামগুলি চিহ্নিত করে তা ভোটার তালিকা থেকে মুছে ফেলা প্রয়োজন। এটাও মনে রাখতে হবে, অসমের হিংসায় উদ্বাস্তু হওয়া মানুষের পুনর্বাসনের সময় এই অনুপ্রবেশকারীরা যেন কোনও মতেই পুনর্বাসনের সুযোগ ও 'আধার কার্ড' তৈরির সুযোগ না পায়। অখিল ভারতীয় কার্যকারী মণ্ডল সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়া দেবার অসমাপ্ত কাজ অবিলম্বে সমাপ্ত করা হোক এবং রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জিকা (National Register of Citizens) সম্পূর্ণ ও ব্যবস্থিত করা হোক।

অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল দেশভক্ত প্রতিটি নাগরিকের কাছে আহ্বান জানায়, এই সমস্যাটিকে রাষ্ট্রীয় সমস্যা মনে করে স্থানে স্থানে বিদেশী অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিতকরণ তথা ভোটার তালিকা থেকে তাদের নাম বাদ দেওয়ার কাজে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করার। বিদেশী অনুপ্রবেশকারীদের কোনও কাজ দেওয়া বা সমর্থন করা শুধু বেআইনী নয়, তা দেশের পক্ষেও ভয়ঙ্কর বিপদ।

।। প্রস্তাব : ২ ।।

চীনের ব্যাপারে অখণ্ড রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা নীতি জরুরি

১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধের ৫০ বছর পূর্ণ হয়েছে। সেই যুদ্ধে দেশের সীমান্ত রক্ষায় যে সমস্ত বীর সৈনিক প্রাণ আহুতি দিয়েছিলেন, অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল তাদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছে। হিমালয়ের লাদাখ ও অরুণাচল প্রদেশের বরফে ঢাকা যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের অনেক প্রেরণাদায়ী ঘটনা সেই বীর সৈনিকদের পার্থিব শরীরের সঙ্গেই চাপা পড়ে আছে। আজ ৫০ বছর পরেও তাঁদের পার্থিব শরীর পর্বতশিখরে পাওয়া যাচ্ছে।

বাস্তবে সেই সব শহীদদের অপর্যাপ্ত যুদ্ধসামগ্রী ও অসম সংখ্যার উপর নির্ভর করে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। সর্বাধিক দুঃখের ঘটনা, নিজেদের অক্ষমতা চাপা দেবার ঘৃণ্য প্রয়াসে দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্ব সেই বীর সৈনিকদের বলিদান ও শৌর্যগাথাকেও চাপা দিয়েছিল। অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে সেই সমস্ত শহীদদের পরাক্রম ও বলিদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করার অনুরোধ জানাচ্ছে।

অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল ভারতের অখণ্ডতার প্রতি নিজেদের দায়বদ্ধতা স্মরণ করছে। ১৯৬২ সালের যুদ্ধ রাষ্ট্রের কাছে একটি দুঃখের স্মৃতি। আমাদের মাতৃভূমির প্রায় ৩৮ হাজার বর্গকিলোমিটার ক্ষেত্র আক্রমণকারী চীনের কাছে হারাতে হয়েছিল। 'আকসাই চীন' আজও চীনের দখলে। আমাদের সংসদ ১৪ নভেম্বর, ১৯৬২, এক সর্বসম্মত প্রস্তাবে দখলকরা প্রতিটি ইঞ্চি জমি ফিরিয়ে আনার সংকল্প গ্রহণ করেছিল। অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল এই কারণে বেদনা অনুভব করে যে, সরকার সেই উদ্দেশ্য প্রাপ্তির জন্য কোনও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে কেবল প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার বৈধতা প্রদান করার জন্য চীনের সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে আলোচনা করে চলেছে। ১৯৬২ সালের পরও চীনের আক্রমণের কোনও বিরাম নেই। ভারত-তিব্বত সীমান্তে তিনটি ক্ষেত্রেই বারবার সীমা অতিক্রম করে ধীরে ধীরে আমাদের জমির দখল করে চলেছে।

একথা আজ সবাই জানে যে, ১৯৬২ সালের পরাজয়ের জন্য আমাদের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক নেতৃত্ব সরাসরি দায়ী। তৎকালীন নেতৃত্ব বাস্তবকে অস্বীকার করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজেদের বাস্তববোধহীন দৃষ্টির কারণে সর্দার প্যাটেল

এবং শ্রীগুরুজীসহ দেশের অনেক সম্মানিত ব্যক্তির হুঁশিয়ারিকে অগ্রাহ্য করেছে। চীন প্রথমে তিব্বত দখল করেছে, পরে আমাদের ওপর আক্রমণ করেছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই যুদ্ধের তথ্য আজও সাউথ ব্লকের আলমারিতে বন্ধ পড়ে আছে। আরও দুর্ভাগ্যপূর্ণ, এখনও পর্যন্ত কোনও সরকার হেন্ডরসন ব্রুক্স - পি. এস ভগতের রিপোর্টসহ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ্যে আনেনি। অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল দাবি করছে এই রিপোর্টগুলিকে অবিলম্বে প্রকাশ্যে আনা হোক, যাতে সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে রাজনৈতিক, কূটনৈতিক এবং সৈনিক নেতৃত্ব তখনকার ভুলগুলি থেকে শিক্ষা নিতে পারে।

পুরো ভারত-তিব্বত সীমান্তে চীন সামরিক দৃষ্টিতে বায়ুসেনার জন্য ঘাঁটি, ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন, সেনা ছাউনি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নির্মাণ করে ফেলেছে। অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল সরকারের কাছে আগ্রহ করছে সীমান্তে চীনের আক্রমক আচরণের কারণে বিপদের যে পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে, তার জন্য সীমা সুরক্ষায় এবং ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত অর্থের ব্যবস্থা করুক। ভারতীয় সেনার 'পর্বতীয় আক্রামক সৈন্যবল' (Mountain Strike Corps) কে দৃঢ় ও বিকশিত করার দাবি সরকারের সিদ্ধান্তহীনতা ও লাল ফিতের ফাঁসে আটকে গেছে। আধুনিক যুদ্ধ কেবলমাত্র সীমান্তে হয় না। সেই কারণে চীনের অপ্রত্যাশিত আক্রমণ ক্ষমতা বুঝে সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণ ও প্রযুক্তিগত সর্বাঙ্গীন বিকাশ অত্যন্ত জরুরি। মিশাইল ক্ষেত্রে আমরা যেখানে নিজেদের সফলতায় গর্বিত, সেখানে আজও আমাদের সৈনিকদের ব্যবহারের অধিকাংশ সামগ্রীই আমদানীর উপর অত্যধিক নির্ভরশীল।

আমাদের দেশের শক্তি, সূচনা যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিল্প ও বাণিজ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে চীনের অনুপ্রবেশ এবং আমাদের নদীগুলির জলপ্রবাহ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার চীনা মতলব অত্যন্ত চিন্তার বিষয়।

অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল সাইবার টেকনিক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে চীনের দিক থেকে তৈরি হওয়া বিপদ সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। সাইবার যুদ্ধের প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার উন্নতির জন্য চীন বিপুল পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ করে এতটাই উন্নতি করেছে, যার সাহায্যে তারা আমেরিকার মতো অতিবিকশিত দেশের সাইবার ব্যবস্থাকেও পঙ্গু করে দিতে পারে। আমেরিকা এসম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ এবং প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরি করছে। অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল ভারত সরকারের কাছে আগ্রহ করছে, ভারী শিল্পক্ষেত্রে যেখানে আমাদের অগ্রগতি প্রশংসনীয়, সেখানে সাইবার সুরক্ষার ক্ষেত্রটিতেও যথোচিত প্রগতি ও বিকাশের উপর গুরুত্ব দেওয়া হোক।

ভারত বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করতে সদা তৎপর। দুই দশক পূর্বে আমরা আমাদের পূর্বাভিমুখ বিদেশ নীতির (Look East Policy) অন্তর্গত পূর্ব এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা শুরু করেছি। ভারত সর্বদা বিশ্বশান্তিতে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করেছে। অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল ভারত সরকারের কাছে আগ্রহ করছে, ১৯৬২ সালের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে চীনের সম্পর্কে এক 'অখণ্ড রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা নীতি' তৈরি করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রাথমিকতা দেওয়া হোক, যাতে আমরা আমাদের উদার আদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে পারি।

"সেদিন আমরা একত্র হইনি—আজও নয়"

কত বিপদ গিয়েছে। কই একত্র তো হইনি। বাহির থেকে যখন প্রথম আঘাত নিয়ে এল মহম্মদ ঘোরী তখন হিন্দুরা সে আসন্ন বিপদের দিনেতেও তো একত্র হয়নি। তারপর যখন মন্দিরের পর মন্দির ভাঙতে লাগল, দেবমূর্তি চূর্ণ হতে লাগল, তখন তারা লড়েছে, মরেছে, খণ্ড খণ্ড ভাবে যুদ্ধ করে মরেছে। তখনও একত্র হতে পারল না। খণ্ডিত ছিলেম বলেই মেরেছে, যুগে যুগে এই প্রমাণ আমরা দিয়েছি।

[কালান্তর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'স্বামী শ্রদ্ধানন্দ' প্রবন্ধ—মাঘ ১৩৩৩]

সৌজন্য : আশিস কুমার মঙ্গল
৩৩, গোরাচাঁদ বোস রোড, কলকাতা-৭০০০০৬

জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য
৩২৫.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ৭.০০ টাকা

চিঠিপত্র

মুসলমানদের করণীয়

১৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ সংখ্যায় স্বস্তিকার সম্পাদকের লেখা পড়লাম। আই পি এস নজরুল ইসলাম তাঁর বইয়ে যা লিখেছেন সেই বিষয়ে মাননীয় সম্পাদকের মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখা প্রয়োজন। আসলে নজরুল আর ৫ জন মোল্লাবাদী ইমামদের মতবাদই তুলে ধরেছেন। গান্ধীজীর ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম-কে সমালোচনা করে বলেছেন, মুসলমানরা আল্লাহ-র বান্দা, কোনও ঈশ্বরের বান্দা নয়। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, শ্যামাপ্রসাদ এমন কি সমস্ত হিন্দু নেতারাই সাম্প্রদায়িক। একথা শুধু নজরুল কেন সিপিএম এবং কংগ্রেসের কোনও কোনও নেতারা ভোটের সময় মুসলমান তোষণ করার জন্য বলে থাকেন।

স্বাধীনতার প্রাক্কালে কমিউনিস্টদের স্লোগান ছিল— 'পাকিস্তানের দাবি মানতে হবে তবেই ভারত স্বাধীন হবে।' পাকিস্তান ও বাংলাদেশে আজ শুধু কাগজে-কলমে কমিউনিস্টদের নাম আছে। কোনও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নেই। মুসলিমদের গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং-এর ষড়যন্ত্রের আগের দিন জ্যোতি বসু সোহরাবুদ্দিনের সঙ্গে একযোগে ধর্মতলায় মিটিং করেছিলেন। ইতিমধ্যে নজরুলের সমর্থনে নাকি মুসলমান যুব-সমাজ এগিয়ে আসছে। নজরুল বাংলার নতুন কেজরিওয়াল হবেন? তবে যদি মুসলিম তোষণ ভাটা পড়ে। তবে নজরুলের আশা সফল হবে না। তার নতুন পরিকল্পনা, যেমন এস সি, এস টি এবং ও বি সি-দের সঙ্গে পাবেন না। যোগেন মণ্ডল পাকিস্তানের পক্ষে গিয়ে পূর্ব-পাকিস্তানের তথা পাকিস্তানের যোগাযোগ মন্ত্রী হন। তখন বাংলাদেশে (পূর্ব পাকিস্তানে) কিছু নমশূদ্রদের হত্যা করা হয়। এ বিষয়ে যোগেন মণ্ডল পালিয়ে এপার বাংলায় চলে আসেন। সুতরাং নজরুলবাবু, আপনি বন্দেমাতরম পছন্দ না করলেও এস সি, এস টি, ও বি সি পছন্দ করেন এতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে নজরুল নতুন দল গঠন করলে মুসলমান তোষণ অনেক কমে যাবে। তাতে মুসলমানদেরও মঙ্গল, হিন্দুদেরও মঙ্গল! তোষণ করে ভালো করা যায় না। তোষণই পরবর্তীতে শোষণে পরিণত হয়। নজরুলবাবুকে অনুরোধ করব--- ওইসব বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাদের বাদ দিয়ে এবার আপনি লালন ফকিরের জীবনী ও গানগুলি পড়ুন।

—**বৈদ্যনাথ ঘোষ, বারাসাত, উঃ ২৪ পরগণা।**

ভারতে অমুসলমানদের করণীয়

বৃটিশ সরকার যখন ভারতকে স্বাধীনতা দেবার উদ্যোগ নিচ্ছিল, তখন মুসলীম লীগের নেতা মহম্মদ আলি জিন্না দাবী তুললেন, ভারতকে দু'ভাগ করে মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান দিতে হবে। হিন্দু ভারতে মুসলমানরা সুবিচার পাবে না। ভারতের ৯৭ শতাংশ মুসলমান পাকিস্তান চাইল। লীগ দাবি করল সম্পূর্ণ পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান নিয়ে হবে পশ্চিম পাকিস্তান ও সম্পূর্ণ বাংলা ও আমাদের কিয়দংশ নিয়ে হবে পূর্ব পাকিস্তান। শেষ পর্যন্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দাবিতে থানাভিত্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে পূর্ব পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গ ভারতে থেকে গেল। ১৯৪৭-এর ১৪/১৫ আগস্ট ভারতকে বিভক্ত করে তৈরি হলো পাকিস্তান ও ভারতবর্ষ। তখনকার ভারতের ২৩ শতাংশ মুসলমানের জন্য দুই পাকিস্তান মিলিয়ে ২৭ শতাংশ ভূমি দেওয়া হলো। যে মুসলমানরা ভারতে সুবিচার পাবে না বলে পাকিস্তান সৃষ্টি করেছে, অথচ পাকিস্তানে যায়নি, ভারতে থেকে গেছে, তারা অনুপ্রবেশকারীদের সাহায্য দিয়ে ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা পরিকল্পিতভাবে বাড়িয়েছে। ভোটের টোপ দিয়ে সরকারকে অনুপ্রবেশকারীদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা নিতে দেয়নি। তারা 'মুসলমানদের করণীয়' বই লিখছে। দাবী করছে, মুসলমানদের সংখ্যা অনুপাতে চাকুরি দিতে হবে, এমপি, এম এল এ বানাতে ও সরকারি উচ্চপদে নিয়োগ করতে হবে।

তাই ভারতে অমুসলমানদের এখন করণীয় কি?

(১) অনুপ্রবেশকারীদের প্রত্যেককে খুঁজে বের করতে হবে। কথার টান দেখে তাদের পরিবার সমেত আলাদা করে কুপার্স ক্যাম্পের মতো বড় বড় জায়গায় রেখে সশস্ত্র পাহারায় ঘিরে রাখতে হবে। তাদের পূর্বপুরুষের নাম ও ঠিকানা জানতে হবে। নির্বাচন কমিশনকে এই কাজ দ্রুততার সঙ্গে করতে হবে যাতে ২০১৪ সালে সাংসদ নির্বাচনের আগে অন্তত ৮০ শতাংশ অনুপ্রবেশকারীকে ভারত থেকে বহিষ্কার করা যায়। ট্রাইব্যুনাল আইনে এদের বেশিদিন আটকে রাখা যায় না। আর ভারতীয় মুসলমানদের জন্য কী করা উচিত?

(১) হিন্দুকোড বিলের মতো সমস্ত ভারতীয়ের জন্য ইউনিফরম সিভিল কোড বিল করতে হবে। আন্দোলন করে এই আইন ২০১৩ সালের মধ্যে চালু করতে হবে। তুরস্ক, মিশর, ইরান, ইরাকে এক বিবাহ আইন রয়েছে। পাকিস্তানেও সরকার নিযুক্ত আরবিট্রেটরের অনুমতি ছাড়া একাধিক বিবাহ করা যায় না। ভারতের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রাহ্য করা হবে না।

(২) আইন করতে হবে, কোনও ভারতীয় পুরুষের দুইটির বেশি সন্তান হবে না। আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর কোনও দুই বা অধিক সন্তানের পিতা সন্তান লাভ করলে চাকুরিত হলে চাকুরিচ্যুত হবেন ও চাকুরিপ্রার্থী হলে বিবেচিত হবেন না। তিনি সরকারি ঋণ ও অনুদান থেকেও বঞ্চিত হবেন। তার পরে জন্মানো সন্তানকে হয়তো নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করা যাবে না, কিন্তু যে হারে বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে, আন্তর্জাতিক স্তরেও তা পরে বিবেচিত হতে পারে। যাঁরা দেশ ভাগের সময় পাকিস্তানে যাননি, তাদের সুবিচার পেতে পাকিস্তানে যাওয়া উচিত ছিল। এখানে থাকলে, শিক্ষা ও অন্যান্য যোগ্যতা থাকলে তবেই এম পি, এম এল এ ও উচ্চ সরকারি পদ পাওয়া যাবে। কোনও বিশেষ সংরক্ষণ দেওয়া যাবে না।

—**হৃষীকেশ কর, বি বি-১৭৯**
সল্টলেক।

একটি অনুরোধ

'খোলা চিঠি'-র নিবন্ধকার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-কে রাজীব গান্ধী সরকারের অর্থমন্ত্রী বলে উল্লেখ করছেন— (স্বস্তিকা, ১.১০.১২)। বস্তুত, মনমোহন সিং-এর অর্থমন্ত্রিত্বের সূচনা ১৯৯১ সালে পি ভি নরসিমা রাও-এর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে। তার আগে পর্যন্ত ১৯৮৫ সাল থেকে তিনি যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ছিলেন।

পত্রিকার গুণমান এবং গ্রহণযোগ্যতার কথা স্মরণে রেখে তথ্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে নিয়মিত কলম লেখক যত্নবান হবেন, এই অনুরোধ।

—**বিমলেন্দু ঘোষ, কলকাতা-৬০।**

চৈতন্যযুগের পরবর্তী নতুন ধারার মন্দির

পর্ব — ১৩

দলপতিপুরের মন্দির

ডঃ প্রণব রায়

বাংলার মন্দিরে মন্দিরে

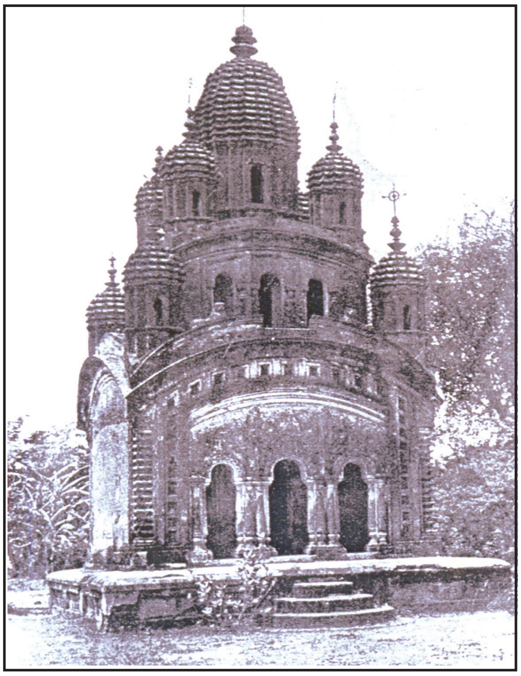

মাখালদের সঙ্কর্ষণ, রাধাদামোদরের 'নবরত্ন', দলপতিপুর (ঘাটাল)।

দলপতিপুর :

মেদিনীপুর জেলার খড়ার পুরসভার অন্তর্ভুক্ত এবং খড়ারের দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত দলপতিপুর যে একসময় একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল, তা বেশ বোঝা যায়। এই গ্রামের অতীত ইতিহাস তেমন জানা না গেলেও গ্রামটির নামের সঙ্গে খ্রিস্টিয় সতেরো শতকের গোড়ায় অল্প দূরবর্তী বরদার রাজা দলপতের নামের সঙ্গে এই গ্রামের নাম যুক্ত, তা অনুমান করা যায়। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বের (১৬০৬—১৬২৬ খৃ.) গোড়ার দিকে রচিত 'বাহারিস্তান-ই-গয়তি' গ্রন্থে এই দলপৎকে চন্দ্রকোণার রাজা চন্দ্রভাজের নিকট আত্মীয় বলা হয়েছে। অবশ্য তখন তিনি নাবালক ছিলেন। ওই গ্রন্থে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে, এঁরা তখন সকলে দিল্লীর বাদশাহের বিরুদ্ধাচরণ করেন। বরদা থেকে প্রায় দু-মাইলের ব্যবধানে এই দলপতিপুর গ্রামটি তাই অতীত ইতিহাসের স্মারকরূপে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামটির মধ্যে নানা পটী বা 'মহল্লা', চওড়া চওড়া রাস্তা, দু-একটি প্রাচীন পুকুর এবং নানা জাতির বসবাস থেকে এটি যে এককালে শ্রীমণ্ডিত ছিল, তা অনুমান করা যায়। এখানে এখনও অনেক মন্দির থাকলেও খুব প্রাচীন কোনও মন্দির দেখা যায় না বা প্রাচীন কোনও ইমারতের চিহ্ন পাওয়া যায় না। এই গ্রামে পূর্বদিকে প্রাচীন 'দারির জাঙ্গাল' সড়ক (পরবর্তীকালে 'নন্দকাপাসিয়া রোড') উত্তর-দক্ষিণে বহু দূর চলে গেছে। এটি একসময় 'বাদশাহী সড়ক' বলে পরিচিত ছিল। মুঘল সৈন্যেরা এই পথ দিয়ে সুদূর পশ্চিমে ওড়িশায় যাতায়াত করত। সম্ভবতঃ এই সড়ক দিয়ে খ্রিস্টিয় ষোল শতকের শেষ দিকে তোডরমল, মানসিংহ প্রভৃতি যোদ্ধা পাঠান সৈন্যের বিরুদ্ধে অভিযান করতেন। কাজেই এই গ্রামটি একটি ঐতিহাসিক গ্রাম মনে করা অসঙ্গত নয়।

দলপতিপুরের মন্দিরগুলির সবই উনিশ শতকে নির্মিত। প্রচলিত 'বাংলা'-রীতির প্রায় সব মন্দিরই এখানে আছে--- 'চাঁদনি', 'দালান', 'রত্ন', 'দেউল'। এখানে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মন্দির মাহিষ্যজাতীয় মাখালদের সঙ্কর্ষণ রাধাদামোদরের 'নবরত্ন'। এর আনুমানিক উচ্চতা প্রায় ৫০ ফুট। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকালীন লিপি; 'সকাব্দা ১৭২৫/২'। ১৭২৫ শকাব্দ বা ১৮০৩ খৃস্টাব্দে এটি নির্মিত হয়। মন্দিরের সামনের দেওয়ালে চুনবালির ফুল লতাপাতার নক্সা। কার্নিশের নীচেও দু-পাশে 'টেরাকোটা' আছে— দশাবতার, রাধাকৃষ্ণ, ঢেঁকিবাহন নারদ, যশোদার দধিমন্থন ও শ্রীকৃষ্ণের ননীচুরি, গণেশ, কার্তিক, কালী, কৃষ্ণবলরাম, গোপীদের বস্ত্রহরণ ইত্যাদি। মন্দিরের দ্বিতল ও ত্রিতল। দ্বিতলে যাওয়ার সংকীর্ণ পথ আছে, কিন্তু ত্রিতলে যাওয়ার কোনও সিঁড়ি নেই। রাসপূর্ণিমায় এই মন্দিরে বিশেষ পুজো হয়। মন্দিরের পূজক গৌড়াদ্যবৈদিক শ্রেণির ব্রাহ্মণ। এই গ্রামের মাহিষ্যজাতীয় মিদ্যাদের শ্রীধরজীউর 'পঞ্চরত্ন' মন্দির বাংলা ১২৩৫ সালে (১৮২৮ খৃ.) নির্মিত হয়। গর্ভগৃহের দেওয়ালে কালো রঙে 'পঙ্কের কাজ' (পঙ্খের কাজ) কিছু আছে। কার্ণিশের নীচে ও দেওয়ালের দু-পাশে পোড়ামাটির মূর্তির ('টেরাকোটা') মধ্যে দশাবতার, দশানন, গণেশ, দশভুজা মহিষমর্দিনী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কাঠের দরজায় দেবদেবীর বিভিন্ন মূর্তিসহ সুন্দর কারুকার্য আছে।

'নয়ভোগের মাড়ো' নামে পরিচিত 'দেশ ষোল আনা'র বুড়ো রায় শিবের 'সপ্তরথ' দেউল ১২৫৭ বঙ্গাব্দে (১৮৫০ খৃ.) প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মঠাকুরের একটি 'পঞ্চরত্নে' কিছু 'টেরাকোটা' আছে। শীতলানন্দ শিবের একটি 'সপ্তরথ' দেউলও আছে। সেটি ১২৭১ সালে (১৮৬৪ খৃ.) প্রতিষ্ঠিত হয়। রায়কোঙারদের (সদ্‌গোপজাতীয়) কনকেশ্বর শিবের 'পঞ্চরত্ন' দেউলটির কোনও লিপি না থাকলেও উনিশ শতকে নির্মিত বলে অনুমান। দলপতিপুর গ্রামে আরও দু-একটি প্রাচীন মন্দির ছিল। কালক্রমে সেগুলি নিশ্চিহ্ন।

বামাচারী তান্ত্রিক

নবকুমার ভট্টাচার্য

বটুকনাথ উপাধ্যায়কে অনেকেই চেনেন না। তিনিও নিজেকে লুকিয়ে রাখতেই চান। তবুও বিন্ধ্যাচল চিত্রকূট বেনারসে বটুকনাথ পরিচিত এক নাম। কাশীর কেদার ঘাটে বটুকনাথকে মাঝে মাঝেই দেখা যায়। চিত্রকূটে অনসূয়া মায়ের মন্দিরের একটু দূরেই যদিও তাঁর একটা ভাঙা আশ্রম রয়েছে, তবুও বটুকনাথ বছরের অনেকটা সময় কাটান উত্তর কাশীতে। বটুকনাথ বামাচারী তান্ত্রিক। তারাপীঠ বক্রেশ্বরের তান্ত্রিকদের মতো অবশ্য বটুকনাথ তন্ত্র বেচে উপায় করেন না। ছাত্রাবস্থায় বটুকনাথ ছিলেন চরম নাস্তিক। ঈশ্বর দেবতা-দ্বিজে ভক্তি থাকলেও মন্ত্র-তন্ত্রে বিশ্বাস ছিল না। থাকবেই বা কি করে! ইঞ্জিনিয়ারিং-এর একজন ছাত্রের কাছে তন্ত্রচর্চা ছিল বুজরুকি। সেই বুজরুকি পরীক্ষা করতে গিয়েই বটুকনাথ আজ তান্ত্রিক। আর বুজরুকি ধরতে গিয়েছিলেন বিন্ধ্যাচলের কেদারেশ্বর শাস্ত্রীর। যিনি ছিন্নমস্তা মন্ত্রে দীক্ষিত এবং পূর্ণাভিষিক্ত। কেদারেশ্বর শাস্ত্রী উচ্চমার্গের সাধক। তাই তাঁর সঙ্গে পাঞ্জা কসতে গেলে ভেতরের ভিত শক্ত হওয়া চাই। তখন বটুকনাথের তা ছিল না। অন্য কৌশল অবলম্বন করে বটুকনাথ ধীরে ধীরে হয়ে উঠলেন কেদারেশ্বর অনুরাগী। শুনেছিলেন কেদারেশ্বর পঞ্চমকার নিয়ে সাধনায় বিশ্বাসী। সুরা এবং নারীর লোভে বটুকনাথ বনে গেলেন কেদারেশ্বরের চেলা। কিন্তু যে আকর্ষণে কেদারেশ্বরের চেলা হওয়া, গুরুগৃহে গিয়ে দেখলেন সব ভোঁ ভাঁ। কেদারেশ্বর অন্য সাধনার মানুষ। বিশুদ্ধচিত্ত জিতেন্দ্রিয় নির্বিকার অদ্বৈতভাবপরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধকই পঞ্চতত্ত্বযুক্ত সাধনার অধিকারী। যিনি সাধনপথে বহুদূর অগ্রসর হয়েছেন কেবলমাত্র সেই সাধকই যথার্থতঃ এরকম ভাবনা করতে পারেন। কেদারেশ্বর সেই জাতের সাধক। বটুকনাথের সুরাপ্রীতি শুনে প্রথম প্রথম কাঁচা হলুদ আর ঈক্ষুগুড় বা মধু মিশ্রিত জল দিতেন। পরে বলতেন, বাপু হে! বাজারের ধেনো খেয়ে নেশা হয় না কেবল শরীর নষ্ট হয়। তুমি এক বছর যদি আমার কথামতো চলতে পারো, তবে পাকা নেশাখোর হয়ে উঠতে তোমার বেশি সময় লাগবে না। সাধনা করো, কুলকুণ্ডলিনীকে জাগাও। মস্তিষ্কের ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে যে রস নিশ্রিত হবে তাই তো সেরা মদ। নিজেকে ব্রহ্মত্বে প্রতিষ্ঠিত করো। নিজ শরীরের মধ্যে প্রকৃতি পুরুষের মিলনই তো সেরা সঙ্গম। স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গম শিবশক্তির সামরস্য, একটি গূঢ় আধ্যাত্মিক ব্যাপার। যোগীসাধক সাধনার দ্বারা স্বদেহস্থ শিবশক্তির মিলন ঘটিয়ে এই চরম আনন্দলাভ করেন, পরিপূর্ণতা লাভ করেন। পঞ্চমকারের মর্ম বুঝতে গেলে এই যে একে দুই এবং দুইয়ে এক, তন্ত্রশাস্ত্রের কথায় চণকের মতো। দ্বিধাভূত অথচ এক— এই পরম তত্ত্বটি অনুধাবন করতে হবে। অর্থাৎ অদ্বৈতে দ্বৈত এবং দ্বৈতে অদ্বৈত পঞ্চমকারের এই মূল তত্ত্বটি বুঝতে হবে।

বটুকনাথ আজ বামাচারী তান্ত্রিক। পঞ্চমতত্ত্বের সাধকও। নিজেকেই শিবস্বরূপ আর নিজেকেই শক্তিস্বরূপ মনে করেন। কাশীবিদ্যাপীঠ আয়োজিত 'পঞ্চমতত্ত্ব' নিয়ে সেমিনারে উচ্চকণ্ঠে জানালেন— 'পঞ্চ মকার মানে মদ্যপান আর নর-নারীর সঙ্গম নয়। নারী সাধকের কাছে মানবী নয়। স্বয়ং মহাশক্তি। তিনি জানেন মহাশক্তিই জন্মকালে জননী, স্নেহকালে কন্যা, ভোগসঙ্গিনী ভার্যা আবার অন্তকালে তিনিই কালিকা। নটীকপালিকা প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ।'

বটুকনাথের তন্ত্রশিক্ষা আজও চলছে। তাঁর মতে নিজেকে জানা এবং দেশের কল্যাণের জন্য তন্ত্রসাধনা জরুরি। পরম বৈভবশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে গেলে শক্তি সাধনা প্রয়োজন। আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র এই বার্তাই দিয়েছেন। শ্রী অরবিন্দ শক্তিসাধনা করেছেন। এ জন্যই তন্ত্র মানে মারণ, বশীকরণ ইত্যাদি নয়। তন্ত্র অপৌরুষের জ্ঞান বিশেষ।

অলংকরণ : রমাপ্রসাদ দত্ত

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

নবাঙ্কুর

হোতু-কোতু উপাখ্যান

কালীপুজোর রাতে পুলিশের অত্যাচার

কোতুর ছোটো-ঠাকুর্দা, মানে বাবার ছোটোকাকা স্বদেশী করত। হিংসার পথ ছেড়ে অহিংসার বাণী ছড়িয়ে দেশসেবার কথা ভাবেনি। কেউ একচড় মারলে আরেক গাল পেতে দেওয়ার বোকা-বোকা পরামর্শকে পাত্তা দেয়নি। তার নীতি ছিল, যে এক ঘা মারবে তাকে পাঁচ ঘা ফিরিয়ে দিতে হবে। প্রায়ই মারপিট হোত। মার খেতো, মার দিত। সে সময় পুলিশের এক হোমরাচোমরা লোক ছিল উইলিয়াম ডেভিড। লোকে বলত ঠ্যাঙাড়ে-সাহেব। কথা নেই বার্তা নেই কোথাও হঠাৎ হাজির হয়ে আচমকা লাঠি চালাত। পালাত অনেকে। দুচারটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে আশ মিটিয়ে পেটাত। মুখের ভাষা ছিল খুব খারাপ। কোনওরকম ভদ্রতা-সভ্যতার ছাপ তার কথাবার্তা আচরণে ছিল না। কয়েকজনকে খুনও করেছিল। বেপরোয়া ঘুষ নিত। ওর সঙ্গী ছিল দয়ারাম উপাধ্যায়। আর গণেশ ভট্টাচার্য। দুজনেই জাতে বামুন। দেখতে ভয়ঙ্কর। কাজকর্মে দয়ামায়ার কোন ছাপ থাকত না। পুলিশের উর্দিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে ভালো গুছিয়েছিল। অজয় রায়কে থানায় নিয়ে গিয়ে পিটিয়েছিল তিনজন। অজয়ের অপরাধ ছিল, ছাত্রদের উপর যখন লাঠি চালাচ্ছিল পুলিশ তখন বাধা দেয়। পুলিশ বাধা পেলে চিরকালই হিংস্র হয়ে ওঠে। অজয় রায়কে সমর্থন করেছিল কোতুর ছোটো-ঠাকুর্দা অমরেশ। আরও কয়েকজন। সবাইকেই পেটায় উইলিয়াম ডেভিড আর তার দুই সাগরেদ। পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পাবার পর অজয় রায়রা সিদ্ধান্ত নেয় পুলিশের উর্দি পরে যারা সাক্ষাৎ শয়তান তাদের টিট করবে। যেভাবেই হোক।

সুযোগ এসে গেলো অল্পদিনের মধ্যেই। কালীপুজোর রাতে চারদিক ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। জিপ নিয়ে টহলে বেরিয়েছে ডেভিড। সঙ্গে দয়ারাম আর গণেশ আছে। নাথুলাল-এর মিষ্টির দোকানে গিয়ে পাঁচ সের লাড্ডু আর হাজার টাকা চেয়েছিল। নাথুলাল-এর ছেলে পবন বলেছিল 'এক সের লাড্ডু আর দুশো টাকা দেবো।' গণেশ আর দয়ারাম বলেছে, 'পুলিশ হলো বাবার মতো। যা বলবে শুনবি। আর না শুনলে থাবড়া খাবি।' পবন বলেছে, 'আমরা যা দিতে পারবো, তাই দেবো। জোর করছেন কেন?' গণেশ চোখ পাকিয়ে বলে, 'খুব বেড়েছিস দেখছি! তুলে নিয়ে গিয়ে কম্বল ধোলাই দিলে বুঝে যাবি পুলিশের কথা না শুনলে কি হয়!' অজয় দোকানে এসেছিল মিষ্টি নিতে। সব শুনে মনে মনে ঠিক করল, এরা অনেক বেড়েছে। আর নয়। দোকানের কাছেই জিপ লাগানো। তাতে বসে আছে ডেভিড। দয়ারাম বলল, 'আমরা রাত দশটায় আসবো। দশ হাজার টাকা আর দশ সের লাড্ডু রাখবি।' একজন জিজ্ঞেস করল, 'থানায় কালীপুজো হচ্ছে? যাবো নাকি?' অজয় বলল, 'থানায় সব সময় ফুর্তির পুজো আর বলি হচ্ছে।' গণেশ কড়া চোখে তাকিয়ে কিছু না বলে চলে গেল। অজয় কি একটা চিরকুট লিখে পবনকে দিল। তাতে লেখা ছিল, 'পুলিশকে কোনওরকম ঘুষ দেবে না।'

রাত নটায় অজয় সিদ্ধান্ত নিলো কি করবে। পুলিশ নয়, ওরা ক্রিমিন্যাল। অজয়ের সঙ্গে আরও ছজন থাকল। নাথুলাল-এর দোকানের একটু আগে জিপ লাগাল সেলিম। ডেভিডের পছন্দের ড্রাইভার। নাথুলাল-এর দোকানে গিয়ে গণেশ আর দয়ারাম দেখে বেশ ভিড়। বলতেও পারছে না কিছু। সব কর্মচারীই ব্যস্ত। গণেশ বলল নাথুলালের ছেলে পবনকে, 'আমাদের দাও।' পবন বলল, 'দিচ্ছি।' সে এক সের লাড্ডুর প্যাকেট আর দুশো টাকা দিলো। দয়ারাম বলল চোখ পাকিয়ে, 'পাঁচ সের লাড্ডু আর হাজার টাকা চাই।' দোকানে ঝামেলা পাকাতে চাইছে দুজন। ওদিকে লাড্ডুর দারুণ চাহিদা।

অমরেশ তরুণ শুভাশিস বিপুল তৎক্ষণে ডেভিডকে বেঁধে ফেলেছে। শুধু তাকে বাঁধা নয়, তার উর্দি খুলে লুঙ্গি পরিয়ে দিয়েছে। সেলিমকে গাছে বেঁধেছে। গাড়ি স্টার্ট করেছে বিপুল। দুজনকে রেখে এসেছে একটা পুরনো বাড়ির সামনে। জিপ আবার ফিরে এসেছে দোকানের কাছে। দয়ারাম আর গণেশ দোকানে ঝামেলা পাকাতে চাইছিল। অজয় সামনে এসে বলল, 'আপনাদের মিষ্টি আর টাকা গাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছে। সামনে দেওয়া ঠিক নয়।' দয়ারাম আর গণেশ গাড়ির সামনে যেতেই আটটা সক্রিয় হাত তাদের বেঁধে ফেলল।

ডেভিড আর সেলিমকে ম্যানহোলের গর্তে ঢুকিয়ে দিয়েছিল অজয়রা। তিনদিন বাদে তাদের মৃতদেহ গঙ্গায় ভেসে ওঠে। পোশাক ছিল গাড়িতে। দয়ারাম আর গণেশকে মেরে আধমরা করে দেয়। দয়ারাম পরে পাগল হয়ে যায়। গণেশ পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। পুলিশের জিপটা পাওয়া গিয়েছিল খালের ধারে। পুলিশ কিছুদিন বাদে অজয়দের মধ্যে দুজনকে ধরে। বিচার চলার সময় দেশ স্বাধীন হলো। ছাড়া পেলো কিছুদিন পরে। পঙ্গু গণেশ ভিক্ষে করত। পাগল দয়ারাম চিনতে পারত না কাউকে।

হোতু এ কাহিনী শোনে কোতুর কাছে।

কৌশিক গুহ

বইয়ের টানে

সবাইকে পড়তে উৎসাহ দেয় সুতনু

দেওয়ালির সময় বই কেনা আর বই উপহার দেওয়ার ব্যাপারটা মনে রাখে সুতনু। বই কেনার সময় নিজের পছন্দকে গুরুত্ব দেয়। ছোটোদের সেই বই-ই দেয় যা তার ভালো লাগে। ছোটোবেলায় অনেক বই পড়েছে। কোনও কোনও বই একাধিকবার পড়া হলেও নতুন মনে হয় বারবার। ওইভাবে সে অনেককে বইপড়ায় উৎসাহী করেছে।

কোনও কোনও ভালোলাগা বই পাঁচ কপি কিনে রাখে। খুব প্রিয়জনদের উপহার দেয়। সুতনুর দ্রুত পড়ার অভ্যেস রয়েছে। মনেও রাখতে পারে। বড়োদের গল্পের বই পড়তে ভালো লাগে না তার। ছোটোদের বইগুলো তার আলমারিতে সাজানো রয়েছে। কোনও বই না-পড়া নেই। নিজের সংগ্রহের সব বই মনে থাকে। নিজে পছন্দ করে বই কেনার অভ্যেস স্কুলে পড়ার সময় থেকে। মায়ের কাছে উৎসাহ পেয়েছে বেশি। এখন মাকে সে বই কিনে দেয়। মা ধর্মের বই আর বেড়ানোর বই বেশি পছন্দ করে। সুতনুর জন্মদিনে মা নিজে পছন্দ করে বই কেনে। মায়ের দেওয়া বই কত যত্নে রয়েছে। সেসব বই কাউকে পড়তে দেয় না।

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. ভারতের সবচেয়ে বড় রাজ্য? সব থেকে ছোট?

২. সব থেকে বড় জেলা? সব থেকে ছোট জেলা?

৩. কতগুলো জেলা আছে দেশে?

৪. কোন জেলায় লোকসংখ্যা বেশি?

৫. সংবিধানে কটি ভাষা স্বীকৃতি পেয়েছে? নাম?

উত্তর ১. রাজস্থান। গোয়া। ২. কচ্ছ, গুজরাট। মাহে, পন্ডিচেরী। ৩. ৬৪০টি। ৪. উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। ৫. অসমিয়া, বাংলা, বোড়ো, ডোগরি, গুজরাটি, হিন্দি, কানাড়ি, কাশ্মিরী, কোঙ্কনি, মৈথিলি, মালয়ালাম, মণিপুরী, মারাঠী, নেপালী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, সংস্কৃত, সাঁওতালি, সিন্ধি, তামিল, তেলুগু, উর্দু, ইংরেজি।

ছোটোদের বলছি

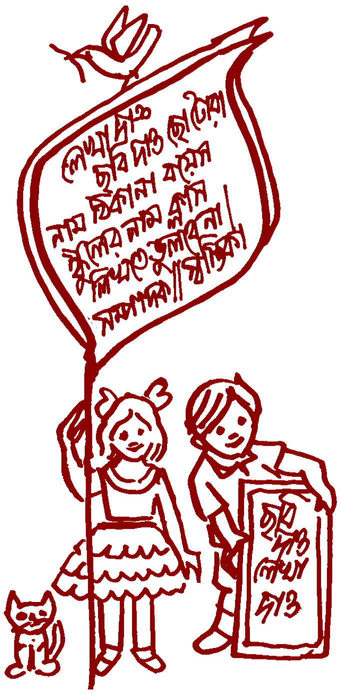

উল্টো পাল্টা

এক ভদ্রলোক শুয়ে শুয়ে একটি বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু চশমাটি তাঁর চোখেই রয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ পরে আর একজন তাঁকে ওই অবস্থায় দেখে ডেকে বললেন, 'মশাই, চশমাটি খুলে ঘুমোন।' পাঠক ভদ্রলোক বললেন— 'সে কি বলছেন মশাই, চশমা না পরে ঘুমোলে স্বপ্ন এলে দেখব কি করে?'

২

খোকা : মা কাল থেকে আমি আর স্কুলে যাব না।

মা : কেন রে?

খোকা : স্কুলে মাস্টারমশাই এটার মানে কি ওটার মানে কি জিজ্ঞেস করে আমার কাছ থেকে সব কিছু শিখে নেয়।

৩

হরিমুদির দোকান থেকে ভুতো প্রতিদিন টুকটাক এটা সেটা কেনে। একদিন সে একটি দেশলাই কিনল। হরিমুদি দেশলাইটির সঙ্গে একটি দেশলাই কাঠি খোলা পড়েছিল সেটা

ভুতোকে দিয়ে বলল, 'নে, এটা ফাউ।' বলে একটু হাসল।

ভুতো একটু আনমনা ধরনের। কি চিন্তা করে পাশের একটি খড়ের গাদাতে সেই ফাউ কাঠিটি জ্বেলে আগুন লাগিয়ে দিল। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতে— হৈ চৈ করে সবাই জল এনে নিভিয়ে ভুতোকে উত্তম মধ্যম লাগিয়ে দিল। তার কিছুক্ষণ পরে সব ঠাণ্ডা হলে যে যার কাজে চলে গেলো। ভুতো নিজের মনে বলতে লাগল— 'বাব্বাঃ ফাউটাতেই এত! এখনও তো আসলে হাত দিইনি।'

সুকমল কুমার সংকলিত

মৃত্যুঞ্জয়ী শৃঙ্গজয়ী এক মহিলার কথা

মিতা রায়

হাসি-আনন্দ আর স্বপ্নে ভরা জীবনে যখন কোনও ব্যাধি এসে বাসা বাঁধে; তখন আমরা অত্যন্ত ভেঙে পড়ি শারীরিক ও মানসিকভাবে। জীবনের পেশা ও নেশার স্বপ্নগুলো স্তব্ধ হয়ে যায় তখন। অন্ধকার নেমে আসে চোখে মুখে। শেষ পর্যন্ত অনেকেই হতাশার আগুনে পুড়ে জীবনটাকেই শেষ করে দেয়। সেক্ষেত্রে আলোক-বর্তিকার মতো তুলে ধরা যায় এমন এক বিদেশিনীর জীবনের কথা— যিনি মারণ ব্যাধি ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েও মনের জোরে সুস্থ হয়ে উঠে নতুন আনন্দে তাঁর শৃঙ্গজয়ের নেশায় মত্ত হয়েছেন।

বিদেশিনী অস্ট্রেলিয়াবাসী শ্যারন কোর্স। থাকেন অস্ট্রেলিয়ার কেয়ার্নস শহরে। তিনি ও তাঁর স্বামী অ্যালেন কোর্স এক অদ্ভুত নেশায় বুঁদ, তা হলো পর্বতশৃঙ্গ জয়ের নেশা। চাকরিজীবনের অবসরে বেরিয়ে পড়েন ট্রেকিং-এ। দেশ-বিদেশে ছোট ছোট পাহাড়ের ভিকট্রি স্ট্যান্ডে পৌঁছে যান অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে। কিন্তু তাতে দম্পতি তুষ্ট হন না; আরও আরও উঁচু পর্বতচূড়ায় পৌঁছে যেতে চান তারা। যে অনাবিল আনন্দে ভরে থাকেন তাঁরা, হঠাৎই বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো সেই আনন্দ নিরানন্দে ভরিয়ে দিয়েছিল এক ভয়ানক দুঃসংবাদ। সদাচঞ্চল হাস্যময়ী শ্যারন কখনই বুঝতে পারেননি তাঁর শরীরে কখন ক্যান্সারের মতো দুরারোগ্য ব্যাধি বাসা বেঁধেছে। তাহলে কি এই স্বচ্ছন্দজীবন এবার স্তব্ধ হয়ে যাবে! না, তা হতে দেবেন না শ্যারন। তাই সোজা চিকিৎসকের কাছে গিয়ে যা কিছু পরীক্ষা করালেন তার ফলাফলে ধরা পড়ল স্তন ক্যান্সার। ক্যান্সার রোগই মারাত্মক, তার ওপরে মহিলাদের স্তন ক্যান্সার এক মানসিক বিপর্যয় ডেকে আনে।

শৃঙ্গজয়ের পাশাপাশি শুরু হলো শ্যারনের জীবনযুদ্ধে মৃত্যু জয়ের লড়াই। শেষ পর্যন্ত সুস্থ হওয়ার কারণে স্তন বাদ দিতেও কুণ্ঠিত হলো না শ্যারণ। মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত হলেও এক লহমায় বুঝে গেল, পর্বতজয়ের মতো জীবনে এ এক চড়াই উৎরাই-এর উত্তরণ। পর্বতশৃঙ্গ জয়ে কত বিপদ আসে। প্রতি মুহূর্তে মনে হয় এই বুঝি সামনে মৃত্যু ফাঁদ। পরক্ষণেই তা পেরিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া। তাহলে জীবনেও মৃত্যুর হাতছানিকেই-বা জয় করে এগিয়ে যাবে না কেন শ্যারন! কয়েকটা বছর অনেক সংগ্রাম করেও কোনও মুহূর্তে পর্বতশৃঙ্গের জয়ের স্বপ্ন দেখতে ভোলেননি। দুঃসাহসী দুর্দাম এই বিদেশিনী এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। নতুন করে যেন জীবনকে উপলব্ধি করছেন। সবচেয়ে আনন্দের খবর হলো, মৃত্যুসংগ্রামে জয়ী শ্যারন শুরু করেছেন ট্রেকিং এবং গত বছরে স্বামী অ্যালেনের সঙ্গে ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্ট ভিকট্রি স্ট্যান্ড ধরতে সক্ষম হয়েছেন। জীবনের বিপর্যয়ের সময়ে অগণিত মানুষের সহযোগিতা পেয়েছেন শ্যারন। আত্মীয়স্বজন এবং সর্বোপরি স্বামী অ্যালেনের সহযোগিতা ও সহমর্মিতা শ্যারনকে সুস্থ হয়ে উঠতে সক্ষম করেছে।

কোর্স দম্পতি থেমে থাকার মানুষ নন। নতুন উদ্যমে সুস্থ শরীর নিয়ে ২০১২-তেও বেরিয়ে পড়বেন পর্বতারোহণে এমনই পরিকল্পনা আছে। এবারের লক্ষ্য তিব্বতের প্রতিটি শৃঙ্গ— যার একেকটার উচ্চতা প্রায় ৮০০০ ফুট। তার জন্য প্রশিক্ষণ চলছে পুরোদমে। নিজের জীবন দিয়ে চরম অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন শ্যারন যে, মনের জোর থাকলে প্রতিকূল পরিস্থিতিকে পেরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলা যায়।

শুধুমাত্র পর্বতচূড়ায় পৌঁছনোর আনন্দে শ্যারন কোর্স থেমে থাকেননি, তিনি দেশ-দেশান্তরে বিভিন্ন সেমিনার করেন, বক্তৃতা দেন। সাধারণ মানুষকে বোঝাতে চান যে, কোনও ব্যাধি ব্যাধিই নয়; যদি মনের অদম্য ইচ্ছে দিয়ে তা মোকাবিলা করা যায়। জীবনকে শেষ করে দেওয়াটা কোনও কথা নয়। তাঁকে বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রণ জানায় বিভিন্ন সংস্থা। সেইসব আলোচনায় প্রাপ্ত অর্থ স্তন-ক্যান্সারের সচেতনায় কাজে লাগান। জীবনের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে উপদেশ দেন। 'আমরা করব জয়'— এটাই হবে জীবনের লক্ষ্য। এমন এক দৃঢ়চেতা মৃত্যুভয় তুচ্ছকারী শৃঙ্গজয়ী বিশ্বের নারীদের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এক পথপ্রদর্শক।

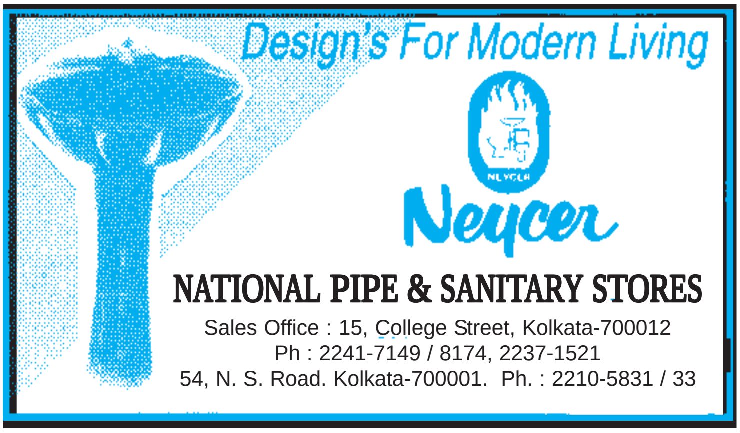

দড়ি ধরে মারো টান

সঞ্জীব বাগচী

শান্তি কিসে হয়?
রাজা যদি মাঠে বসে হাওয়া খায়,
তবে রাজা শান্তি পায়।

রাজা কি শান্তি পেলেন? মহাশান্তি? রাজ্যপাটের দায়িত্ব সামলানোর হ্যাপা অনেক। তার চেয়ে বরং অপর কাউকে দায়িত্ব দিয়ে দিলে হাত পা ছড়িয়ে বসা যায়। সুখ দুঃখের গল্প করা যায়। খেয়ে শান্তি, ঘুমিয়ে শান্তি, কি দরকার এত বড় দেশটার দায়িত্ব সামলে। কেউ তো আর আঙুল তুলতে পারবে না।--- কমনওয়েলথ গেমস কেলেঙ্কারি, টু-জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারি, কয়লাগেট কেলেঙ্কারি, শুধুই কেলেঙ্কারি আর কেলেঙ্কারি, কালো টাকার ছড়াছড়ি। কেউ যদি গরীবি হঠাও অভিযানে বিদেশী ব্যাঙ্কে জমে থাকা কালোটাকা ফিরিয়ে আনতে বলে তার পেছনে দাও বাঁশ। প্রজা সাধারণ দাম বৃদ্ধির চাপে করুক হাসফাঁস। তাতে অন্ততঃ শান্তি তো পাওয়া যাবে। কিছু মোসায়েব, কিছু তাঁবেদার বলবে সিংহবিক্রমটা কীরকম দেখাল দেখলি।

মশাই-এ দেশটা নাকি গণতান্ত্রিক। জনগণ নাকি দেশটা চালায়। গণতন্ত্র। আমরা সবাই রাজা। আমাদের এই রাজার রাজত্বে। সবার ঘরেই আছে রাজকোষাগার— সবাই বিত্তবান। প্রতিদিন সকল মানুষের জোটে আহার। কাউকে খেতে হয় না পিঁপড়ের ডিম অথবা লতাপাতা সিদ্ধ। তাই হয়ে ওঠো উদার মনে প্রাণে অর্থনীতিতে। বিদেশীরা নিজের দেশের মাটি ছেড়ে এদেশে করুক চাষ— শিল্পের, ভোগ্য দ্রব্যের। বিদেশ আসুক, চুষে নিয়ে যাক সব, দেশের মানুষের হোক সর্বনাশ। তাহলেই তো রাজা মাঠে বসে হাওয়া খাবে শান্তি পাবে কারণ ঘরের লোকের থাকবে না কোনও কাজ। তারাও তো ভাতের বদলে হাওয়া খাবে। রাজা খাবে কৃত্রিম ঘরে কৃত্রিম মাঠে পরিশুদ্ধ বাতাস আর বাকিরা...সে কথা থাক। ও রাজামশাই আপনারা নাকি করেছিলেন এদেশটাকে স্বাধীন করার লড়াই? স্বাধীনতাও এনেছিলেন, দেশটাকে ধর্ম দিয়ে করেছিলেন ভাগ। তবু অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ আপনারা দেশটাকে বেচে করছেন কাটমানির ভাগ। কালোটাকাটা ফেরালেও তো ভাগ হতে পারত। ছিঁটেফোঁটা জনগণকে দিলে দুটো দিন খেয়ে বাঁচত। মশাই এফ ডি পাই কি? গায়ে না মাথায় মাখে? কে জানে? ছেষট্টি বছরে দেশটা চলেছে আপনাদের ইচ্ছায়— শেষ হয় নাই। জানার চেষ্টা বৃথা তাই। আপনাদের শেখানো বুলিতে। তাইতো মগজধোলাইয়ের যন্ত্রে ধোলাই হওয়া মানুষেরা আপনাদের ভাষায় কথা বলে। একটু এদিক ওদিক হলে মুখবন্ধ করান টাকার জোরে। তবু যে রাজামশাই কিছুলোক জেগে উঠেছে। এর আগে রাজার আসনে অটলজীকে দেখেছে। দেখেছে বুঝেছে মানুষের সেবা কী। তাই সাধু সাবধান, আপনাকে রাজা সাবধান করছি। কারণ মানুষ উঠলে জেগে। মানুষের দল ভাঙ্গবে রাজার মূর্তি, দখল করবে সিংহাসন। উঠবে গর্জন— দড়ি ধরে মারো টান রাজা হবে খান খান। অতএব রাজা প্রজার করুন কল্যাণ। দেখবেন তাতেই হবে শান্তি।

With Best Compliments From
AmbujaRealty

অতিথি কলম

জি পার্থসারথি

জন্মেই মৃত্যুর লক্ষণ

প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদাম্বরমের পাকিস্তানের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কার্যকারণের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কয়েকটি নির্দিষ্ট টেলিভিশন গ্রুপ ও পত্রিকার সাংবাদিকদের নিয়ে তিনি পাকিস্তান সফর করে এলেন। কতটাই না বাস্তব চিন্তা! ওই সফরে 'Times now'-এর সাংবাদিক নিকুঞ্জ গর্গকে পাকিস্তান ভিসা দিতে অস্বীকার করে। ২৬/১১-এর সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় পাকিস্তানের জড়িত থাকার কথা প্রমাণ করতে 'টাইমস নাও' নানান তথ্য সামনে রেখেছে। তাই শায়েস্তার

নিকুঞ্জ গর্গ

দরকার। পাকিস্তান ভিসা না দিয়ে শাস্তি দিতে চাইলো। কিন্তু চিদাম্বরমের দ্রুত প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তান নিকুঞ্জ গর্গকে ভিসা দিতে বাধ্য হয়।

প্রবীণ স্বামী 'দ্য হিন্দু' পত্রিকার দিল্লী ব্যুরোর প্রধান। পাকিস্তান প্রযোজিত সন্ত্রাসবাদীদের গতিবিধি বিষয়ে ভারতীয় বিশেষজ্ঞ। ইসলামাবাদ যাবার জন্য ভারতের বিদেশমন্ত্রক কর্তৃক তিনি আমন্ত্রিত হন। এস এম কৃষ্ণা-র ওই সফরে নেতৃত্ব দেবেন। ভারতের এই সাংবাদিককে পাকিস্তান হাই কমিশনে ডাকা হয়। দুইজন কূটনৈতিক, যাঁরা পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই-এর সদস্য তাঁকে অনেক বোঝালেন যে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদীদের হামলার কথা না লিখে আমেরিকার ষড়যন্ত্রের কথা লিখতে।

তাঁরা আরও বলেন, পাকিস্তানি ও ভারতীয় সাংবাদিকেরা এক সঙ্গে আমেরিকার ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করুক। তিনি তাঁদের সঙ্গে হাত মেলাতে অস্বীকার করেন। পাকিস্তান 'হিন্দু' পত্রিকার সম্পাদককে জানায় তারা অন্য সাংবাদিকদের নাম করুক। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস এম কৃষ্ণা তার প্রতিবাদ করেননি। পাকিস্তানে কোন সাংবাদিক ভারতের বিদেশমন্ত্রীর সফরকারী হাবে তা ঠিক করে দিচ্ছে পাকিস্তান। হিন্দু পত্রিকা অবশ্য নতুন নাম দিতে অস্বীকার করে।

প্রবীণ স্বামী

পাকিস্তানের ক্রমাগত উদ্ধতভাবের কাছে ভারতীয় টিম ভীত হয়ে পড়ে। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র-মন্ত্রী ২৬/১১-র উপর ভারতীয় আম-আদমীর মনোভাবকে অস্বীকার করে যখন বিবৃতি দেন তখনও ভারতীয়রা ছিল চুপচাপ। পুরাতনকে ভুলে নতুন ভাবে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। অর্থাৎ ২৬/১১ ভুলে যাও। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পোষাক সাজসজ্জা ভারতীয়দের যে পছন্দ সে সম্পর্কে বিদ্রূপপূর্ণ মন্তব্য করতে পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলো ছাড়েনি। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে পাকিস্তান ও ভারত ২৬/১১-র দোষীদের বিচার করার ব্যাপারে দুই দেশই যে সন্তুষ্ট এই মর্মে বিবৃতি দিয়েছে। কি করে সন্তোষ প্রকাশ করা হলো যেখানে হাফিজ সঈদকে বিচারের জন্য হাজির করা হয়নি? কি করে ২৬/১১-এর ঘটনাকে সমঝোতা এক্সপ্রেসের ঘটনার সঙ্গে এক করা হলো? আমরা কি 'শ্যাম আল সেখের' কূটনৈতিক নাটক ভুলে গেলাম।

এস এম কৃষ্ণা পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে তাদের মুখে সুসম্পর্কের কথা শোনেন। কৃষ্ণা পাকিস্তানের লাহোর ও ইসলামাবাদে তাদের সঙ্গে মিলিত হন। কিন্তু পাকিস্তানের জাতীয় জীবনে বর্তমান বাস্তব অবস্থার বিষয়টি তিনি চর্চা করেননি। পাকিস্তানের বর্তমান সরকারকে সরিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পুনঃবহাল হবে। কারণ ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে নির্বাচন রয়েছে। পাকিস্তান দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে দুর্বল দেশ। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট ঘনিয়ে আসছে। অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ২.৪ শতাংশ, সেভিংস রেট ১০ শতাংশ, ট্যাক্স জি ডি পি-এর ৯.৪ শতাংশ। 'ক্যালেন্স অফ পেমেন্ট'ও সংকটে। সরাসরি কোনও বিদেশি বিনিয়োগ নেই। শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষার বন্ধু চীন ও স্থায়ী বন্ধু সৌদি আরব পাকিস্তানের প্রতি সদয় নয়। অস্ত্রের জন্য আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের উপর নির্ভরশীলতা এবং অন্যদিকে অর্থনৈতিক পুনঃগঠনের জন্য ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে পাশ্চাত্যের দ্বারে যাওয়া— এমনই অবস্থা এখন পাকিস্তানের।

গভীর সংকটে পাকিস্তান। সেনাবাহিনীর জন্য সম্পদ সংগ্রহ করাও কঠিন। সীমাবদ্ধ ডাইমেনশন রয়েছে। আবার গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো আফগানিস্তানের সীমান্তে ১,৫০,০০০ সৈন্য রাখতে হচ্ছে। ডুরান্ড লাইন দিয়ে আক্রমণ ক্রমাগত বাড়ছে। একদা সম্পদ বলে বিবেচিত হোত 'তাহারই

তালিবানিই পাকিস্তান’ (টি টি পি)। এই টি টি পি-র সঙ্গে পাঞ্জাবী চরমপন্থীরা হাত মিলিয়েছে। এই দুই দলই ‘কামরা এয়ারবেস’-এ আক্রমণ চালিয়েছে। আমেরিকা কোনওভাবেই মোহে পড়ে নেই। তারা ভালোই জানে পাকিস্তানের কৌশলগত সম্পদ হচ্ছে টি টি পি। আমেরিকার ‘খৃস্টানী ফেয়ার’ যিনি পাকিস্তানের সেনা বিশেষজ্ঞ তিনি বলেন ‘গত এক দশক ধরে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সন্ত্রাসবাদীদের হাতকে শক্ত করেছে। তারা কোনও আতঙ্কবাদী প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করেনি। পাকিস্তানের রাজনীতিতে আতঙ্কবাদী নেতা ও লস্কর-ই-তৈবাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে পাক প্রতিরক্ষা কাউন্সিল।

পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সংকট যদি বেড়ে যায় তবে আম-জনতার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে ভারত সন্ত্রাসীবাদী আক্রমণ ঠেকাতে পারে। নতুন ভিসা নীতির সাহায্যে অধিক পাকিস্তানীর ভারতে আসা সম্ভব হবে। ভারত তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরির বার্তা দিতে পারবে। নিরাপত্তা ও কাশ্মীর সংক্রান্ত বিষয়ে আরও সদর্থক পদক্ষেপ সুনিশ্চিত করা যাবে। ব্যবসা ও বাণিজ্য বিনিয়োগ বাড়ানোর চেষ্টা করা যাবে। একথা ভুললে চলবে না কথাবার্তা চালানোই শেষ কথা নয়। আমরা উল্টোটাও করতে পারি। আমরা ২৬/১১-এর ঘটনা ভুলবো না, ক্ষমাও করবো না। এস এম কৃষ্ণা-র পাকিস্তান সফরের পরে ‘ডন’ পত্রিকার এক নিবন্ধে মুইদ ইউসুফ লেখেন— ‘গত দশক ছিল সন্ত্রাস দমনে ভারতীয় সেনা ও কূটনৈতিক ব্যর্থতা। অধিক থেকে অধিকতর মুম্বাই আক্রমণ হতে পারে ভারতকে তা সহ্য করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ভারত আলোচনার রাজনীতি থেকে অর্থনীতির দিকে নজর না দেয়।’

আমরা ‘Summit Diplomacy’-এর প্রস্তুতি নিচ্ছি। ১৯৯৯ সালে Summit (শিখর সম্মেলন) বৈঠক হয়েছিল পাকিস্তান মদতপুষ্ট সন্ত্রাসী আক্রমণকে অগ্রাহ্য করে। পরিণতিতে কারগিল যুদ্ধ। ২০০১ সালে রেড কোর্টের সন্ত্রাসী হামলাকে অগ্রাহ্য করে আগ্রা সামিটের জন্য পারভেজ মোশারফকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এর ফলে পার্লামেন্ট আক্রমণ হয়েছে ২০০৪ সালে। বাজপেয়ী পাকিস্তানের সঙ্গে বিধিবদ্ধ আলোচনায় রাজী হন যখন মোশারফ নুতন করে খোলামেলা আশ্বাস দেন যাতে পাকিস্তানের মাটি থেকে সন্ত্রাসী আক্রমণ হবে না। একথা আমরা বলতে পারি যে পাকিস্তান আমাদের কোনও সুনির্দিষ্ট কথা বা আশ্বাস দেয়নি বা আমরা তা আদায় করতে পারিনি। বার বার আমরা সন্ত্রাসী আক্রমণের গুরুত্ব অনুভব না করে কথা চালিয়েছি তাই বিপদ্জনক সন্ত্রাসী আক্রমণের শিকার হয়েছি।

> **“পাকিস্তান আমাদের কোনও সুনির্দিষ্ট কথা বা আশ্বাস দেয়নি বা আমরা তা আদায় করতে পারিনি। বার বার আমরা সন্ত্রাসী আক্রমণের গুরুত্ব অনুভব না করে কথা চালিয়েছি তাই বিপদ্জনক সন্ত্রাসী আক্রমণের শিকার হয়েছি।”**

(সৌজন্যে : পাইওনিয়ার)

অনুবাদ : নীতিন রায়

নেত্রদান মহাদান

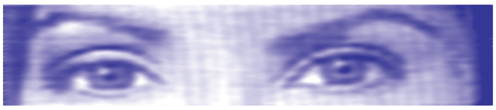

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

‘সেই সময়’ ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার অন্যতম পুরোধা সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রয়াণ-সংবাদ সকলেই অবগত হয়েছেন। পরিণত বয়সের মৃত্যু। কিন্তু শিল্পী, স্রষ্টার কাছ থেকে হয়তো মানুষের বাড়তি প্রত্যাশা থেকেই যায়। একটি দৈনিকের চাকুরে প্রয়াত লেখকের কলম সেই অর্থে শেষাবধি চলমান ছিল। তাঁর স্বকীয়তা, সাহিত্যিক মূল্যায়ন, ভবিষ্যৎ অভিমত ইত্যাদি নিয়ে বিশিষ্ট পণ্ডিতদের চর্চা হয়তো দীর্ঘদিনই জারি থাকবে। তবে যে বিষয়টি একটু আলাদা ভাবে উল্লেখের দাবি রাখে তা তাঁর বিপুল শ্রমসাধ্য ‘সেই সময়’ উপন্যাসটির প্রসঙ্গ। সুনীলবাবু তাঁর সাহিত্য জীবনে লিখেছেন অনেক। বইয়ের সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়েছে। তাদের বৃহদাংশই জনপ্রিয়। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়— কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, রহস্য কাহিনী, ছোটদের লেখা কিছুই তিনি উপেক্ষা করেননি। বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে বহু সময়ই দেখা গেছে এত বহুধা-বিচরণ না করেও হয়তো একটি বা দুটি অবিস্মরণীয় শিল্পকর্মের নিরিখেই কোনও কোনও লেখক অমরত্বের পরিখা ছুঁয়েছেন। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় টলস্টয়ের ‘ওয়ার অ্যান্ড পিস’, ডিকেন্সের ‘টেল অব টু সিটিজ’ বা রোমাঁ রোলাঁর ‘জাঁ ক্রিস্তভ’, মার্কেসের ‘হান্ড্রেড ইয়ার্স’। বিশ্বের সাহিত্যপ্রেমীরা এগুলির সঙ্গে নিশ্চিত ভাবেই পরিচিত। আমাদের বাংলায় সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘জাগরী’, অদ্বৈত মল্লবর্মনের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’, বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ‘চিলেকোঠার সেপাই’ বা তারাশঙ্করের ‘গণদেবতা’র মতো উপন্যাস রয়েছে। এঁরা শুধুমাত্র এই প্রতিনিধিত্বমূলক উপন্যাসগুলির মধ্যেই চিরস্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই বহু বিদ্বজ্জনের মতে সুনীলবাবুর ‘সেই সময়’ ও তাঁর লেখক অমরত্বের ন্যায্য দাবিদার। বইটির মূল্যায়ন বা বিচার কোনওটিরই অধিকার বা ধৃষ্টতা প্রতিবেদক দাবি করে না। তবে বাংলা সাহিত্যের তথা বাংলার

রেঁনেসাস পর্বের সমসাময়িক যে স্বল্পায়ু কেন্দ্রীয় চরিত্রটিকে নিয়ে সুনীলবাবুর আবর্তন তা বিস্ময়কর। তিনি শিবনাথ শাস্ত্রী বিরচিত ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’ গ্রন্থে বর্ণিত বাংলার নবযুগের (১৮২৫-১৮৪০) সময়কালের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে এটিকে বিলম্বিতভাবে ১৮৪০-১৮৭০ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্যসাধক চরিতমালা অনুযায়ী ঠিক এই সময়টিই বাংলায় সরাসরি কথ্য ভাষায় লেখালেখির যথার্থ জনক কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনকাল। দ্বিতীয় পর্বটি উৎসর্গও তাঁকেই। এই সময়টিকেই সুনীলবাবু তাঁর গল্পের নায়ক হিসেবে ভেবেছেন। সেই সুবাদেই এসেছে বাংলা সাহিত্যের প্রত্যুষপর্বের বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, হরিশ মুখার্জী, দীনবন্ধু মিত্রের নাম। ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনের সুবাদে দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, ডেভিড হেয়ার, পাদ্রী লং, ডিরোজিও প্রভৃতি পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদেরাও। এঁদের নিয়ে আলাদা আলাদা হয়তো অনেক জীবনী বা লেখালেখি পাওয়া যাবে। সুনীলবাবুর অনন্যতা সমকালীন ভাষায় কথোপকথনের মাধ্যমে বাংলার এতগুলি প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্বকে রক্ত-মাংসে কাছের মানুষের পরিচিতিতে নামিয়ে আনা। একটু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

(১) মাইকেল প্রিয়বন্ধু গৌরদাসকে এত্তেলা পাঠাচ্ছেন— আমার কাছে এখানে ঢের ঢের টাকা রয়েছে। তুই মিঃ কার-এর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে চলে আয়।

(২) শিবনাথ শাস্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে শুনেছেন ‘‘বঙ্কিম নাকি ডেপুটির চাকরিতে যাওয়ার সময় খানিকটা গঙ্গাজল নিজের জননীর পায়ে ঠেকিয়ে একটা শিশিতে ভরে সঙ্গে নিয়ে যান। ওঁরা ভাটপাড়ার বামুন। খুব গোঁড়া হিন্দু মনে হয়। তবে তাঁর দুর্গেশনন্দিনী অবশ্য পাঠ্য।’’

(৩) ‘আত্মবিলাপ’ সকলেই পড়েছেন। মধুসূদনের অন্তর্নিহিত ভাবটি দেখুন ‘আমার আর লেখার ক্ষমতা নেই। বিষ খেতে ভয় পাই তাই মদ খাচ্ছি।’

(৪) বিধবা বিবাহের সুযোগ নিয়ে লালসা চরিতার্থ করার ঘটনায় বীতশ্রদ্ধ বিদ্যাসাগর রোমান্টিক কালীপ্রসন্নকে তিরস্কার করে বলছেন, ‘‘বিধবাদের অবস্থার সুযোগ নিয়ে উপপত্নী রাখার বদলে লোকে কাম চরিতার্থ করতে বিধবাকে বিয়ে করবে? আমি কি এই উদ্দেশ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলন করতে চেয়েছি?’’ এমন সব অজস্র মনটানা আলাপচারিতায় উন্মোচিত একটি সময় সন্ধিক্ষণ সুনীলবাবুর মুন্সিয়ানায় অসাধারণ উতরে গেছে। নাটককে অনায়াসে ইতিহাসের দিকে আকর্ষিত করেছে। তা বড় পাওনা। উপন্যাস পাঠের স্বাদ নিয়ে পাঠক মানস-ভ্রমণ করতে পেরেছেন বাঙালির ইতিহাসের এক অমূল্য সময়সীমায়। আজও এই বই-এর বিক্রি ঈর্ষণীয়, (প্রথম প্রকাশ ১৯৮১)।

এখন প্রশ্ন জাগে, সুনীলবাবু দুই বাঙলাতেই তাঁর এমন বিপুল জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও বিশেষ করে তাঁর জন্মস্থান অধুনা বাংলাদেশে ঘটে চলা ক্রমিক হিন্দু নির্যাতনের সম্পর্কে কেন এত উদাসীন? তিনি তাঁর প্রশ্নাতীত খ্যাতি ও সম্মানের সূত্রে যে ওজনদায়ী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তাঁর সদ্ব্যবহার করে তাঁর হিন্দু স্বজাতির পক্ষে কি একটা কথাও বলেছেন? বাংলাদেশের নির্মম অত্যাচারের প্রতিবাদী কণ্ঠ সাহিত্যিক তসলিমার এদেশ থেকে বিতাড়ন আটকাতে তিনি কি কোন সদর্থক ভূমিকা নিয়েছিলেন? এক্ষেত্রে অবশ্য বাংলাদেশে তাঁর বই-এর বিশাল বাজারের কথাটাও হয়তো অগ্রাধিকার পেয়ে যাবে। মানসিকতার গুণকীর্তন রাজনীতিক দলের সম্পাদক আগ বাড়িয়ে করেছেন। সেটা স্বাভাবিক। তাঁর সমকালীন অন্যান্য তুল্যমূল্য অনেক জনপ্রিয় সাহিত্যিকই তৎকালীন শাসকদলের সঙ্গে এত গা ঘষাঘষি করেননি। শোনা যায়, তসলিমা বিতাড়নের পরামর্শ তাঁরই। যাই হোক, মৃত্যুর পর কটু কথা বলা নিষেধ। সংবাদপত্রগুলি সে সহবত মেনে চলেছে। তবু, আমাদের অত দায় নেই। সুনীলবাবু নাস্তিক ছিলেন। অর্থাৎ দেব-দেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাসহীন। ক্ষেত্র বিশেষে কটু কথাও বলেছেন। হতেই পারে। কিন্তু পুজো উপলক্ষে তাঁর সরস্বতীর কলমে লক্ষ্মীর আগমনে কোনও ভাটা পড়েনি। একবারও মনে হয়নি মাকেই যখন মান্য করি না তখন তাঁর প্রসাদ ভক্ষণে কি লোভ থাকা উচিত? সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নিজেই বলে গেছেন, 'কেউ খুব ভালো বা খুব খারাপ নয়।' এটি তাঁর ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। তাই হয়তো তসলিমা নাসরিন সংবাদপত্রে নিষ্ঠুর সত্যিটা বলেছেন, "তিনি বড় লেখক ছিলেন, মানুষ হিসেবে মোটেই নয়"। এই সময় (২১।১০) তবে কি তাঁর আত্মনৈবিক 'অর্ধেক জীবন' আসলে অর্ধেক সত্য?

সূত্র : সেই সময় : লেখকের কথা (টাইমস অফ ইন্ডিয়া) (২৬।১০)

ভাতুয়ার ছেলে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ব্যাপারটা এখনও আমার কাছে রহস্যময় লাগে।

ছেলেটিকে আমি দেখছিলাম বড় সুন্দর একটা পরিবেশে। এইসব দৃশ্য আমরা ছবিতে দেখি। কিংবা নিজেরা যখন এই দৃশ্যের মধ্যে উপস্থিত হই, তখন যত না মুগ্ধ হই, তার চেয়েও বেশী ভালো লাগে যখন পরে সেই দৃশ্যটার কথা ভাবি।

খুব ঘন জঙ্গলের মধ্যে সেখানে জায়গাটা একটু ফাঁকা ফাঁকা। চারদিকে ছোট ছোট পাহাড়, মাঝখানে খানিকটা ঢালু উপত্যকা, সেখানে একটা লাল রঙের নদী। 'সবুজ বন, রক্ত নদী', এরকম বলা যেতে পারতো, আসলে নদীটি একটি খুবই ছোট ঝর্ণা। লাল রঙের মাটি ধুয়ে ধুয়ে আসে বলে জলের রং ঠিক রক্তবর্ণ নয়। অনেকটা গেরুয়া গেরুয়া।

দুপুরের ঝলমলে রোদ, অথচ গরম নেই। দুদিন খুব টানা বৃষ্টির পর সেদিন রোদ উঠেছে, এই সব দিনে মন খুব ভালো লাগে।

আমরা নদীটা পেরিয়ে এবং একটা ছোট পাহাড় ডিঙ্গিয়ে একটা মন্দির দেখতে গিয়েছিলাম। শুনেছিলাম, সেখানে নরবলি হয়। এটা অবশ্য কোনো দূর-দুর্গম অঞ্চলের কাহিনী নয়, এই জায়গাটা কলকাতা থেকে মাত্র দেড়শো কি দুশো মাইল দূরে মেদিনীপুরে।

মন্দিরটি জনশূন্য। খুবই ছোটখাটো ব্যাপার, সামনে একটা কাঠগড়া, খুব সম্ভবত সেখানে পাঁঠা কিংবা মোষ বলি হয়।

ফেরার পথে আমরা লাল রঙের ঝর্ণাটার পাশে একটু বসলুম। আমরা অর্থাৎ আমরা দুই বন্ধু এবং বাংলোর চৌকিদার। সে-ই আমাদের গাইড।

যাবার পথেও দেখেছিলুম যে ঝর্ণাটার পাশে কতকগুলি ছাগল চরছে, আর সেগুলিকে পাহারা দিচ্ছে একটি ছেলে। বছর দশ-এগারো বয়েস। রাখাল গোরু চরায়, কিন্তু যে ছাগল চরায়, তাকেও কি রাখাল বলা যায়?

পরনে একটা ইজের, খালি গা। ছেলেটি ছপ ছপ করে ঝর্ণা পেরিয়ে এদিকে এসে একটু দূরে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলে।

আমি হাতছানি দিয়ে ডাকলুম।

ছেলেটি অপলক ভাবে তাকিয়েই রইলো, কোনো সাড়া দিল না।

চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করলুম, ওকে ডাকো তো।

চৌকিদার ধমকের ভঙ্গিতে একটা হাঁক দিল, তাতে ছেলেটির মুখে একটু হাসি ফুটল শুধু, কিন্তু কোনও উত্তর পাওয়া গেল না।

ছেলেটা খুব গোঁয়ার। আমরা অনেকবার ডাকাডাকি করতেও সে গ্রাহ্যই করলো না।

আমি চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করলুম, তুমি চেনো ওকে?

চৌকিদার বললো, ও তো মহাদেব মাহাতোর ভাতুয়া।

তখন জিজ্ঞেস করিনি, তবে ভাতুয়া কথাটার মানে পরে জেনেছিলাম।

আমি আবার ছেলেটিকে বললাম, এই, তোর নাম কী রে? তুই ডাকলে আসিস না কেন?

ছেলেটি তবু উত্তর দিল না। চৌকিদার বললো, স্যার, ওর নাম নেই। ও বোবা,

কথা বলতে পারে না, তাই ওর নাম কেউ দেয়নি। সবাই ছোঁড়া ছোঁড়া বলেই ডাকে।

আসবার সময় মনে হয়েছিল এই জঙ্গল খুব গহন, নিবিড়, নির্জন। আসলে জঙ্গলটি বেশ গভীর হলেও নির্জন নয়। ফাঁকে ফাঁকে অনেক মানুষজন বাস করে। কিছু কিছু চাষবাসও হয়। এই জঙ্গলে বাঘ নেই, তবে বাঘের চেয়ে অনেক বড় আকারের জানোয়ার আছে।

লাল রঙের ঝর্ণার পাশে ছাগল চরানো কিশোরটির সঙ্গে আমার একটু কথা বলার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সে বোবা শুনে একটু মন খারাপ হয়ে গেল। বোবা বলেই বোধ হয় ও মানুষের কাছে আসে না।

আমরা যেই উঠে পড়লুম, অমনি ছেলেটি ঝর্ণা পেরিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। অনেক দূরে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগলো আমাদের। যেন ও লুকোচুরি খেলছে।

বাংলোয় ফিরে এলাম খিদের টানে।

সেদিনই সন্ধ্যেবেলা বেশ কিছু লোকের উত্তেজিত গলার আওয়াজ পাওয়া গেল বাংলোর সামনে।

কিছু কিছু জঙ্গলের মানুষ জানতে এসেছে যে আমাদের কাছে বন্দুক আছে কিনা। আমরা জিপে করে এসেছি বলে ওরা আমাদের হোমরা চোমরা কেউ ভেবেছে। আমি জীবনে কখনো, খুব সখ থাকা সত্ত্বেও বন্দুক ছুঁয়েই দেখিনি।

বন্দুক দরকার হাতি তাড়াবার জন্য।

প্রত্যেকবারই এইখানে একপাল হাতি আসে ফসল খাবার জন্য। এ বছর খরা, তাই জমিতে এখনও ফসল বোনা হয়নি, সেই জন্য হাতিরা এসে ফসল নষ্ট করার সুযোগ না পেয়ে ক্ষেপে গেছে।

অন্য বছর টিন পিটিয়ে এবং মশাল ছুঁড়ে হাতির পালকে তাড়ানো হয়, এ বছর তাতেও হাতিরা যাচ্ছে না। তারা তাদের খাদ্য পায়নি।

কাছাকাছি কোথাও হাতি এসেছে শুনে রোমাঞ্চ লাগে। শহুরে মানুষ জঙ্গলে এসে সত্যিকারের জংলী জানোয়ার দেখতে চায়।

চৌকিদার আমাদের উৎসাহে বাধা দিয়ে বললে, আজ আর রাত্তিরের দিকে যাবেন না, স্যার। সকালে যাবেন।

সে আমাদের কিছুতেই বেরুতে দেবে না সন্ধ্যেবেলা। তার তো একটা দায়িত্ব আছে।

বাংলোর সামনে কিছু লোক তখনও জটলা করছে। আমরা সেখান থেকে চলে গিয়ে বাংলোর পেছন দিকে একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়ালুম। সেখান থেকে হাতি দেখা না গেলেও তাদের ডাক যদি অন্তত শোনা যায়।

কিছুই শোনা গেল না অবশ্য। খানিক বাদে ফিরে এলুম বাংলোয়। অন্য লোকেরাও চলে গেছে।

চৌকিদার বললো, একজনকে পাঠানো হয়েছে বাঁশপাহাড়ীতে। থানায় খবর দেবার জন্য। গভর্ণমেন্ট কোনও ব্যবস্থা না করলে হাতির উপদ্রবে অনেক ঘর বাড়ি এবার নষ্ট হবে।

আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, এই রাত্তিরবেলা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একা একজন গেল? সাহস আছে তো লোকটার? কে গেল?

চৌকিদার বললো, ঐ গুরু মুধগয়ার ভাতুয়া!

হাতির গল্প নয়, এটা ভাতুয়ার কাহিনী!

তখন আমি জিজ্ঞেস করলুম, বারবার ভাতুয়া ভাতুয়া শুনছি। ভাতুয়া মানে কী?

তখন আমাদের বোঝান হলো যে ভাতুয়া এক ধরণের ক্রীতদাস। শুধু ভাত খাওয়ার বিনিময়ে তারা কোনো বাড়িতে কাজ করে। খেতে পায় বলে তারা সব রকম কাজ করতে বাধ্য, এমন কি রাত্রে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে থানায় খবর দেওয়া পর্যন্ত।

এর পরের খবরটি আরও চমকপ্রদ।

সকালে যে ছাগল-চরানো কিশোরটিকে দেখেছিলুম, সে এই ভাতুয়ারই ছেলে।

যে লোক শুধু ভাতের বিনিময়ে এক বাড়িতে জীবন বাঁধা দেয়, তারও সংসার আছে? তারও স্ত্রী, পুত্র, সংসার আছে? কিসের ভরসায় সংসার পাতে?

—ওর ছেলে ভাতুয়া, আর ওর বউ?

—সেও আর এক বাড়িতে ভাতুয়া।

ওদের কোনো নিজস্ব বাড়ি আছে?

—কী করে থাকবে, স্যার? ভাতুয়াদের চব্বিশ ঘণ্টা থাকতে হয়।

আমি চুপ করে রইলুম। বাড়ি নেই, সংসার নেই, তবু একটা পরিবার আছে। মাঝে মাঝে দেখা হয় নিশ্চয়ই ওদের।

লাল রঙের ঝর্ণার পাশের সেই কিশোরটির কথা আমার মনে পড়তে লাগলো বারবার। বোবা বলে তার একটা নামও দেওয়া হয় নি! এই পৃথিবীতে জন্মে একটা নামও কি তার প্রাপ্য নয়?

গাছের আড়াল থেকে সে উঁকি মেরে আমাদের দেখছিল। কী ভাবছিল, কে জানে?

(সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় স্মরণে 'স্বস্তিকা' ১৩৮৬, ইং- ১৯৭৯, পুজো সংখ্যায় প্রকাশিত লেখাটি পুনঃমুদ্রিত হলো)

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর

ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

আঁধারের মধ্যে আলো

অন্য রকম

প্রবীর বিশ্বাস

ভারতের অন্তরাত্মা যখন দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা, মন্ত্রী ও আমলাদের ভ্রষ্টাচারে ক্ষুব্ধ ব্যথিত ও জর্জরিত, হাজার হাজার কোটি টাকার আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ছে জনপ্রতিনিধিদের নাম, ঠিক সেই সময় এক বিরল সততার দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রেখে চমকে দিলেন ডায়মন্ডহারবার মহকুমার ধনবেড়িয়া গ্রামের অধিবাসী গৌতম হালদার। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার, অক্টোবরের ৪ তারিখ। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিদ্যার্থী কার্যকর্তা সন্তোষ সর্দার ও সৌমিত্র মণ্ডল আসন্ন পথসঞ্চলন উপলক্ষে কেশবভবন (আর এস এসের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যালয়) থেকে গণবেশ (সঙ্ঘের ইউনিফর্ম) নিয়ে ফিরছিলেন শিয়ালদা-বারুইপুর লোকালে। ভুলবশত একটা ব্যাগ উক্ত ট্রেনের মধ্যে ফেলে রেখে তাঁরা নেমে পড়েন বারুইপুর স্টেশনে। খোয়া যাওয়া ব্যাগের মধ্যে ছিল মোট ৪০২০ টাকা (৩০টা ১০০ টাকা, ২০টা ৫০ টাকা এবং দুটো ১০ টাকার নোট), দুটো স্বামী বিবেকানন্দের ছবি লাগানো গেঞ্জি, ১২টা বেল্ট এবং হিন্দু জাগরণ মঞ্চের প্রাদেশিক সংগঠন সম্পাদক দিলীপ ঘোষের একটা ভিজিটিং কার্ড।

গেঞ্জিতে বিবেকানন্দের ছবি দেখে আপ্লুত হয়ে পড়েন গৌতমবাবু। বুঝতে পারেন এই ব্যাগ যারাই ফেলে রেখে যাক, তারা বিবেকানন্দ- প্রচারের কাজেই ব্যাপৃত। এও ভাবেন এই ব্যাগ হারালে তাদের বিবেকানন্দ প্রচারের সম্ভাবনা নিশ্চয়ই ব্যাহত হবে। এই ভাবনা থেকেই সেই ভিজিটিং কার্ডের সূত্র ধরে গৌতম হালদার যোগাযোগ করেন দিলীপ ঘোষের সঙ্গে এবং তিনি ব্যাগের মধ্যে থাকা সমস্ত অর্থ ও অন্যান্য জিনিসের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য তুলে ধরেন এবং ব্যাগটা ফেরত দিতে উদ্যোগী হন। সঙ্ঘের দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিভাগ কার্যবাহ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ও হিন্দু জাগরণ মঞ্চের প্রাদেশিক কার্যকর্তা স্বরূপ দত্ত তাঁর বাড়িতে গিয়ে এই মহৎ কাজের জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আসেন এবং গৌতমবাবু ও তাঁর একমাত্র পুত্রকে বিবেকানন্দের ছবি আঁকা দুটো গেঞ্জি তাঁদের হাতে তুলে দেন।

গৌতমবাবু ব্যক্তিজীবনে এক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সামান্য বেতনভোগী এক কর্মচারী। অতি সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা একজন, বাড়িতে অভাবের ছাপ স্পষ্ট। ভ্রষ্টাচারের দুষ্টক্ষত যখন সমাজকে কুরে কুরে খাচ্ছে, ঠিক সেই সময় আমাদের 'সত্যম শিবম সুন্দরম' এই সাধনার সুরে তিনি একটা লয় তুলে দিলেন, যা দীর্ঘদিন আমাদের হৃদয়ে বাজতে থাকবে। এই সমস্ত গৌতমবাবুর জন্য সমাজ আজও ছন্দময় ও সুন্দর হয়ে আছে ও থাকবে। তাঁর ও তাঁর পরিবারের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করি।

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

PIONEER®

নিখুঁত লেখার খাতা

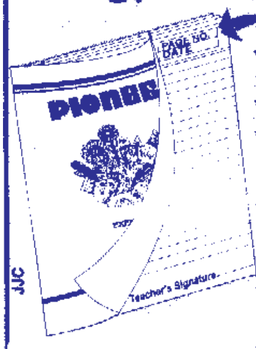

- প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।
- পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
- আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
- ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
- প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
- ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
- প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature........................ কলাম।

PIONEER PAPER CO.
Off: 4a, Jackson Lane(1st floor)
Kolkata-1. Ph:350-4152, 353-0556
Fax:91-33-353-2596.
E-Mail:pioneer3@vsnl.net

PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

'ফিসচুলা, পাইলস্ থেকে বিনা রক্তপাতে চিরমুক্তি'

পায়ুদ্বারের ভেতরে বা বাইরের নানা শিরা উপশিরায় জ্বালাময়, যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতিই হলো পাইলস্।

পায়ুদ্বারের পাশে হওয়া গর্ত থেকে পুঁজ, গ্যাস, রক্ত বা বায়ু ইত্যাদি নির্গত হলে তা হলো ফিসচুলা। এই সমস্ত রোগে রোগীরা এর ওর কথায় টোটকা ব্যবহার করেন। তাতে যন্ত্রণা বেড়েই চলে। ডাক্তারের কাছে গেলে উপদেশ দেন অপারেশনের। পুনঃ পুনঃ অপারেশনেও সারে না। কখনও কখনও সৃষ্টি হয় নতুন সমস্যা, অথচ আমাদের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি বিনা অপারেশনে যন্ত্রণাহীন চিকিৎসার পথ খুঁজে পেয়েছে অনেককাল আগেই। আয়ুর্বেদে ক্ষারসূত্র ও কেমিক্যাল কর্টারির সুনিপুন মিশ্রণে **জীবক আয়ুর্বেদিক স্পেশালিটি সেন্টার** তৈরি করেছে এক অভিনব চিকিৎসা পদ্ধতি। যার সফলতম প্রয়োগে পাইলস এবং ফিসচুলার যন্ত্রণাহীন কার্যকরী চিকিৎসা করা সম্ভব। এই জাতীয় চিকিৎসায় নামমাত্র কাটা ছেঁড়ার প্রয়োজন হয়। তাই রোগী চিকিৎসার পর পায়ে হেঁটে বাড়ী ফিরতে পারেন।

না এটা কোন হাতুড়ে অস্ত্রোপচার নয়, বিগত দশ বছর ধরে যে পদ্ধতিতে এখানে শত শত রোগী চিরতরে সুস্থ হয়েছেন সেই পদ্ধতি জাপানে তোয়ামা মেডিক্যাল কলেজ এবং নেপালে ত্রিভুবন ইউনিভার্সিটির চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরীক্ষিত এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দ্বারা (WHO) স্বীকৃত দিল্লীর AIIMS ও চণ্ডীগড়ের P.G.I. তেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

কি কি চিকিৎসা হয় এই পদ্ধতিতে?

প্রোলাপ্স পাইলস্, ফিসচুলা, ব্লিডিং পাইলস, পাইলোনিডাল সাইনাস, রেক্টোভ্যাজাইনাল ফিসচুলা, ফিসার সবকিছুরই চিরতরে মুক্তি ঘটে।

জীবক আয়ুর্বেদিক স্পেশালিটি সেন্টার

হাকিমপাড়া, হরেন মুখার্জী রোড, G.T.S. ক্লাবের নিকটে জর্জ ইনস্টিটিউট বিল্ডিং, শিলিগুড়ি

ডাঃ এস জে কর, মোবাইল নং-9434877734

—ঃ এখানে রোগীদের দেখার সময় ঃ—

সোমবার থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২.৩০টা পর্যন্ত এবং বিকেল ৫ টা থেকে ৮টা পর্যন্ত।

ও শনিবার ঃ বিকেল ৫ টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

Sharada Travels

ভ্রমণ পিপাসু বাঙালীর নির্ভরযোগ্য সঙ্গী

শারদা ট্রাভেলস্

উলুবেড়িয়া, হাওড়া

প্রত্যুষ মণ্ডল— 9874398337 / 8820329463

❁ গ্যাংটক-নামচি-পেলিং-ইয়ুমথাং ❁ দার্জিলিং ❁ পুরী
❁ সিমলা-কুলু-মানালী ❁ কাশ্মীর ❁ ভাইজ্যাক-আরাকু
❁ দিল্লি-আগ্রা-মথুরা-বৃন্দাবন-হরিদ্বার-মুসৌরী
❁ কেরালা ❁ গোয়া ❁ মুম্বাই ❁ আন্দামান
❁ দেওঘর ❁ সুন্দরবন ❁ সিমলীপাল
❁ শিলং-চেরাপুঞ্জি-গৌহাটি

প্যাকেজ ট্যুরের জন্য যোগাযোগ করুন।

নিজেকে খোঁজার নাটক 'বিকেলে ভোরের সর্ষেফুল'

দেবাদিত্য চক্রবর্তী ॥ সংসৃতি নাট্যদল সম্প্রতি প্রযোজনা করছে ব্রাত্য বসু রচিত নাটক, 'বিকেলে ভোরের সর্ষেফুল।'

এই নাটকের নায়ক অনিরুদ্ধ সেক্টর ফাইভের একটি বিপিও প্রধান। তিনি ও তার চারপাশের মানুষজন আধুনিক পৃথিবীর বিশ্বায়িত জীবনযাত্রায় বিশ্বাসী। কিন্তু এই জীবনযাত্রায় ঊনপঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই অনিরুদ্ধ ক্রমশ ক্লান্তি অনুভব করতে থাকে। এই সময় তার প্রিয় বন্ধু প্রিয়ব্রত তার বাউণ্ডুলে স্বভাবের মেয়ে কোয়েলকে অনিরুদ্ধদের কোম্পানীতে একটি চাকরি দিতে বলে। চাকরি করতে আসা কোয়েল অনিরুদ্ধের প্রেমে পড়ে যায়। অনিরুদ্ধ তাকে এড়িয়ে চলতে চাইলেও সে ক্রমশ অনিরুদ্ধের জীবনে ঢুকে পড়ে। কোয়েল অনিরুদ্ধকে বোঝাতে চায় যে, সে যে জীবনযাত্রায় বিশ্বাসী সেটাই একমাত্র কাম্য নয়। কলেজস্ট্রীটের কফিহাউস, বিভূতিভূষণ, জয় গোস্বামীর লেখাতে আরেকটা পৃথিবী আছে। কিন্তু অনিরুদ্ধ সেগুলিকে নিম্নবিত্তের সুখের কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতে চায়। কিন্তু কোয়েলের ঘেঁষায় এক সময় ভেঙে যায় অনিরুদ্ধর কৃত্রিম মনোজগৎ। ক্রমশ কোন এক সময় সেও ভালোবাসতে শুরু করে কোয়েলকে।

কিন্তু অসম বয়সের বিবাহ বহির্ভূত ওই প্রেম কি কোনও পরিণতি আদৌ পেতে পারে? নাট্যকারের কলম অনুযায়ী তা সম্ভব হয় না। এক ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে কোয়েল ও অনিরুদ্ধকে একসঙ্গে দেখে ফেলে প্রিয়ব্রত ও তার স্ত্রী। যার ফলস্বরূপ কোয়েল নিজেকে তাদের থেকে অনেক দূরে অন্য কোথাও সরিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু অনিরুদ্ধ কি আদৌ ভুলতে পারে কোয়েলকে? তার হারিয়ে যাওয়া কথা, গান, কবিতা সেতো ফিরে পেয়েছে কোয়েলের জন্যই।

এটি নিছকই কোনও প্রেমের নাটক নয়। অনিরুদ্ধের সংলাপে উঠে এসেছে বিশ্বায়নের চরিত্র এবং জমি অধিগ্রহণ আইনের মতো সমসাময়িক ঘটনাও।

নাট্যকারের বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ এবং দেবেশ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনা এই নাটকের সম্পদ। অনিরুদ্ধের চরিত্রে সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কোয়েলের চরিত্রে সুদীপ্তা চক্রবর্তীর অভিনয় খুব সুন্দর। সাবলীল অভিনয় করেছেন দেবাশিস বিশ্বাস, তপন মুখার্জি, কস্তুরী চ্যাটার্জি, অনিন্দিতা মুখার্জি, কল্যাণী বিশ্বাস প্রমুখ শিল্পী।

অনুপম রায়ের সঙ্গীত মনকে নাড়া দেয়। এছাড়া হিরণ মিত্রের মঞ্চ ভাবনা এবং সুদীপ সান্যালের আলোর প্রয়োগ সুন্দর।

'বিকেলে ভোরের সর্ষেফুল' নাটকটি আসলে এই সময়ের প্রত্যেকটি মানুষের নিজেকে খোঁজার নাটক।

টান টান রহস্য নাটক 'ইঁদুরকল'

দেবাদিত্য চক্রবর্তী ॥ বিখ্যাত লেখিকা অগাথা ক্রিস্টির জনপ্রিয় উপন্যাস 'মাউসট্র্যাপের' অনুপ্রেরণায় শৌভনিক নাট্যগোষ্ঠী সম্প্রতি প্রযোজনা করছে তাদের নাটক 'ইঁদুরকল'। এটি একটি টান টান রহস্য নাটক।

এক শীতের মরশুমে দার্জিলিং-এর পান্থনিবাস হোটেলে হঠাৎ খুন হয়ে যান দশ বছর জেল খেটে আসা বয়স্কা মিসেস করবী সেনগুপ্ত। সেখানে আততায়ীর ফেলে যাওয়া চিরকুট থেকে পুলিশ জানতে পারে যে, খুনীর পরবর্তী লক্ষ কার্শিয়াং-এর ড্রিমল্যান্ড হোটেল এবং সে সম্ভবতঃ আরও দুটি খুন করবে।

ড্রিমল্যান্ড হোটেল খুলেছেন মিঃ সুরজিৎ চৌধুরী এবং তাঁর স্ত্রী শিল্পা চৌধুরী। হোটেল খোলার দিনে সেখানে কয়েকজন বোর্ডার ছিলেন— মিঃ ব্যানার্জি, মিস্ দত্ত, অমর চ্যাটার্জি এবং এক সাংবাদিক ভদ্রলোক। সেদিনই পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে একজন ইন্সপেক্টরকে পাঠানো হয় বোর্ডারদের সুরক্ষার জন্য এবং একই সঙ্গে করবী সেনগুপ্তের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করতে। হোটেলের বোর্ডারদের প্রত্যেকের আচরণই যেন রহস্যজনক। অপরদিকে জানা যায়, অমর চ্যাটার্জির সঙ্গে শিল্পার পূর্বপ্রণয় ছিল। কিন্তু সেই ইন্সপেক্টর হোটেলে থাকাকালীনই পরের রাতে খুন হয়ে যান মিস্ দত্ত। ইন্সপেক্টর আবার তদন্ত শুরু করেন। শেষ দৃশ্যে মিসেস শিল্পা চৌধুরীকে একা পেয়ে খুনী তার ওপরও ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য এবার সে ধরা পড়ে যায়।

এখন প্রশ্ন হলো মিসেস করবী সেনগুপ্তের হত্যার সঙ্গে ড্রিমল্যান্ড হোটেলে মিস্ দত্তের খুনের কি সম্পর্ক? শিল্পা চৌধুরীর ওপরই-বা খুনের প্রচেষ্টা হলো কেন? খুনী কে? কি উদ্দেশ্যে সে একের পর এক খুন করে চলেছে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে দিলে নাটক দেখার মজাটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

নাটকে প্রত্যেকে খুব ভালো অভিনয় করেছেন। অসিত ঘোষের করা নাট্যরূপ টান টান উত্তেজনা জিইয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। বাবলু সরকারের করা আলো খুব সুন্দর। খুনের দৃশ্যে গা ছমছমে আলো আঁধারি সৃষ্টিতে তিনি মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। চন্দন দাসের আবহভাবনা এবং পরিচালনা প্রশংসনীয়। পুরো নাটকটিকে রহস্যময়তার আবহে এগিয়ে নিয়ে যেতে তিনি যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।

একথা বলাই বাহুল্য যে 'ইঁদুরকল' নাটকটি একটি আদ্যন্ত মনোরঞ্জনের নাটক।

পুস্তক প্রসঙ্গ

প্রবন্ধগুলো ভাবাল আর উপন্যাসে উঠে এল সমকালীন সমাজের একটা ছবি

শমিতা সাহা

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। আর এই সমাজকে ঘিরেই সাহিত্য। সর্বকালের বিভিন্ন দেশের সাহিত্য গড়ে উঠেছে সমকালীন সেইসব দেশের সমাজকে ঘিরেই। ‘স্বস্তিকা’ পূজা সংখ্যা সেই পরম্পরার-ই সঙ্গী।

বর্তমান ‘স্বস্তিকা’র থিম নিঃসঙ্গতা। রমানাথবাবুর ছোট গল্প দিয়েই স্বস্তিকার পুজো সংখ্যা পর্যালোচনা শুরু করি। রমানাথবাবুর গল্প-উপন্যাস বারবার সমৃদ্ধ করেছে স্বস্তিকার পাতা। তবে বেশ কয়েকবার তাঁর লেখা একঘেয়ে হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এবারেরটা তা থেকে মুক্ত। রমানাথবাবুর লেখনীতে ফুটে উঠেছে নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা। বড় যৌথ পরিবার ভেঙে গেছে বহু আগেই। এখনও যে দু-চারটে রয়েছে তাও ভেঙ্গে যাচ্ছে। আর এই ভগ্নতার মাঝেই গড়ে উঠেছে নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা। অনেকটা যেন ভাঙনধরা নদীর পাড়। রমানাথবাবু একজন প্রবীণ লেখক। নিঃসঙ্গতার উপলব্ধি অন্যদের মতো তাঁর জীবনেও প্রতি পরতে যেন উপস্থিত। সেই একাকিত্বের ভীষণ যন্ত্রণা তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে অভিনয় জগতের একদা প্রসিদ্ধা নায়িকা কনক মিত্রের চরিত্রে। ‘এক নায়িকার কথা’ গল্পে সুন্দর এঁকেছেন বিগত-যৌবনা এক নায়িকার জীবনের করুণ পরিণতি। একসময় তাঁর কত ‘ফ্যান’ ছিল, আজ তাঁর একমাত্র নাতি ‘গোপাল’ও তাঁকে চায় না। ফোন করলে তাঁর সঙ্গে কথা বলার ফুসরৎ তার নেই। অথচ যৌবনে তাঁর ছায়া-ছবি দেখতে কত তরুণ-তরুণী হামলে পড়ত। এক ঝলক তখন দেখেছে— কত তরুণ বাজি ধরত তাঁর ওপর। কালের আবর্তে তাঁর খোঁজ আর কেউ নেয় না। কাহিনিটা রূপক হলেও বাংলায় মধ্যবিত্ত সমাজের এটাই দস্তুর। আর এরই ফাঁকে গড়ে উঠছে অঞ্চলে অঞ্চলে বৃদ্ধাশ্রম। আবাসন নির্মাণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো বণিকসমাজের এটা একটা লোভনীয় ব্যবসা।

নিঃসঙ্গতার আরেকটা উপন্যাস সৌমিত্রশঙ্করের ‘অতলান্ত’। বেশ কয়েক বছর ধরে গল্প উপন্যাস লিখে বেশ নাম কুড়িয়েছেন সৌমিত্রবাবু। তাঁর লেখনী সমৃদ্ধ করে আসছে স্বস্তিকার পুজো সংখ্যা। সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো সৌমিত্রবাবুর লেখা পড়তে একঘেয়েমি লাগে না। পড়া শুরু করলে শেষ না করে থামা যায় না। এবারের ‘অতলান্ত’ এমনই এক দুর্নিবার চমকপ্রদ উপন্যাস। বিভিন্ন সময়ে তাঁর লেখা কাহিনি পাঠককুলকে ভাবনায় অতলান্তে ডুবিয়ে রাখে সম্পূর্ণ অবগাহন না হওয়া পর্যন্ত। কাহিনির নায়িকা কাবেরী উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের এক গৃহিণী। তাঁর সংসার বৃত্তে আছে এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলে মার্কিন প্রবাসী, কন্যাও পাঠসূত্রে বেঙ্গালুরুতে। স্বামী সঞ্জীব বড় চাকুরে। শাশুড়ি সেবার আদর্শ ভারতীয় রমণী। শাশুড়ি বিগতা। এতকিছু থাকতেও কীসের যেন একটা অভাব তাঁর। বস্তুনির্ভর দুনিয়ায় তাঁর চাহিদার কোনও কিছুর অভাব নেই। সঞ্জীব তাঁর সব অভাবই পুষিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর অভাব মননে। যখন কেউই বাড়িতে থাকে না নিঃসঙ্গতা তাঁকে যেন কুরে কুরে খায়। প্রলম্বিত দ্বিপ্রহর যেন শেষ হতেই চায় না। বই পড়ে, দিবানিদ্রায় যেন সময় কাটে না কাবেরী ওরফে রিংকি-র। সৌমিত্রবাবু একটু সাহসী করে তুলেছেন কাবেরীকে। বাল্যবয়সের প্রেমিক জয়ের সঙ্গে যোগাযোগ ছিলই এস এম এসের মাধ্যমে। সংসার, সমাজের প্রাচীর টপকে জয়ের সাহচর্য চায় কাবেরী। ফিরে আসে জয়ের সন্তানকে জঠরে নিয়ে। আবার ফিরে পায় কাবেরী তার স্বামী, পুত্র-কন্যাকে। কিন্তু জঠরের সন্তানের যে ভ্রূণ বয়ে এনেছে কাবেরী, তার পরিচয় কী হবে সেটার মীমাংসার ভার সমাজের হাতে, সংসারের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন সৌমিত্রবাবু।

গণতন্ত্রের কাঠামো যেমন চারটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে তেমন সমাজ ব্যবস্থা কতগুলি মূল্যবোধের ওপর দাঁড়িয়ে। এগুলো হলো ন্যায়, মানসিকতা, সততা প্রভৃতি। এইসব মূল্যবোধগুলি আজকের সমাজে অপসৃয়মান। নীতিহীন, মানসিকতাহীন, অসততার মধ্যে আমরা যে বেঁচে-বর্তে আছি তারই বিরুদ্ধে

এবারে কলম ধরেছেন সুমিত্রা দেবী। ক্ষমতালোলুপ সমু কেন্দ্রের মন্ত্রী হবার লোভে নকশালপন্থী দিদি আর জামাইবাবুকে ধরিয়ে দেয়। মুসলমানের পোশাকে ঝাড়খণ্ডের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। যে সংবাদ চক্রবর্তী বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে কারোর জানার কথা নয় তা কীভাবে পুলিশ খবর পেল তা নিয়ে নিভার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে, তারই মামাতো ভাই কখনও এ কাজ করতে পারে। পরে যখন জানতে পারল নিভা যে, সে আর তার স্বামীকে ধরিয়ে দিয়েছে তারই মামাতো ভাই, তখনই সে বুঝতে পারল বেশ কয়েক বছর আগে পুলিশি নির্যাতনে তার পেটের সন্তানের ভ্রূণ নষ্ট হয়ে যাওয়া আর তার স্বামীকে হারানোর কারণ। এই কথা তার মামার কানে গেলে পুত্রের প্রতি তার ঘৃণার শেষ থাকে না। পতিত সমাজের উপন্যাসে চরিত্রগুলি সুনিপুণভাবে এঁকেছেন সুমিত্রাদেবী।

প্রবন্ধের জন্য স্বস্তিকার প্রসিদ্ধি সুবিদিত। রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী বৈজ্ঞানিক হলেও ইতিহাস-চর্চায় তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য অবাক করে পাঠকদের। 'আজকের লালকেল্লা শাহজাহানের তৈরি নয়' প্রবন্ধটি শুধুমাত্র সুখপাঠ্য নয়, তথ্যসমৃদ্ধও। শাহজাহানের মাতৃদেবী যে হিন্দুকুলোদ্ভূত তা আমাদের অনেকেরই জানা নেই। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ঐতিহাসিকরা শাহজাহানকে অনেক উদার বলে চিহ্নিত করলেও আসলে তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের চেয়ে কম ধর্মান্ধ বা অত্যাচারী ছিলেন এমন নয়। বরং হিন্দু নিগ্রহে, লাম্পট্যে শাহাজাহান তাঁর পূর্বসুরী ও উত্তরসূরীদের মতোই তা আমরা জানতে পারি এই প্রবন্ধ থেকে। লেখাটি অবশ্যই ইতিহাসের ছাত্রদের ভাবাবে এবং মোগল যুগের ইতিহাস নিয়ে যারা চর্চা করে তাদের রসদ জোগাবে।

পত্রিকার সম্পাদক একজন ভ্রমণপিপাসু। বিজয়বাবু নিয়ম করে প্রায় প্রতি বছরই ভারতভ্রমণে যান। এবারে তিনি গিয়েছিলেন লে-লাদাখ। নিপুণ হস্তে তাঁর লেখা ভ্রমণকাহিনি ভ্রমণপিপাসু, প্রকৃতিপ্রেমিক পাঠককুলকে অবশ্যই টানবে 'চল যাই সিন্ধুদর্শনে'।

অমলেশ মিশ্রের 'ভারতবর্ষ বনাম ইন্ডিয়া' প্রবন্ধটি গুণগত দিক থেকে কম কীসের। স্বাধীনতা নিয়ে যাঁরা লড়াই করেছেন তাঁদের উলম্বভাবে দু'ভাগে ভাগ করেছেন তিনি। একদল হলেন 'ইন্ডিয়ান' আর একদল হলেন 'ভারতীয়'। মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল প্রমুখ নেতাদের তিনি আখ্যাত করেছেন ইন্ডিয়ান অভিধায়। কারণ এঁরা উচ্চকুলশীল, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এবং স্বাধীনতা নিয়ে লড়াই করলেও সেকালের মতো ভারতবিরোধী ইংরেজদের এঁরা তল্পিবাহক। ভারত স্বাধীন হলো বটে, চতুর ইংরেজদের ফাঁদে এঁরা পা দিয়ে দু' টুকরো করলেন ভারতকে। পরিতাপের বিষয় ইংরেজরা চলে গেল এইসব তল্পিবাহকদের হাতে দেশটা সঁপে দিয়ে। ক্ষমতা হস্তান্তর হলো না যাঁরা প্রকৃত অর্থে স্বদেশপ্রেমী ভারতীয়দের হাতে। এঁরাই ফাঁসির কাঠে প্রাণ দিলেন, আন্দামানের অন্ধকার কুঠুরীতে জীবনের মূল্যবান সময় কাটালেন, তাঁরা ক্ষমতার আস্বাদ পেলেন না। যাঁরা রক্ত ঝরালেন তাঁদের হাতে ক্ষমতা গেলে হয়তো দেশের পরিস্থিতি এমন হোত না।

তথাগত রায়-এর 'বাঙালি হিন্দুর মূল্যায়ন' প্রবন্ধ আমাদের ভাবায়। আমরা বাঙালিরা মূল্যবোধ হারিয়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছি— এটা বোঝার জন্য তাঁর প্রবন্ধটি দর্পণের কাজ করবে।

এবারের পুজো সংখ্যার আরেকটা উপাদেয় উপন্যাস হলো বৈদ্যনাথবাবুর 'হানাদার ঘুণপোকা বনাম এক রাজকুমার'। বৈদ্যনাথবাবু একজন ইতিহাসবেত্তা। শহরের কয়েকটা বড় সাহিত্যবাসরে তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস নিয়মিত প্রকাশিত হয়। ইতিহাস অবশ্যই সুখপাঠ্য হয় যদি তা তথ্যসমৃদ্ধ এবং কাহিনি-বিন্যাস সুন্দর হয়। বৈদ্যনাথবাবুর উপন্যাসে এর সব উপাদানই রয়েছে। কুমারগুপ্তের নারী বিলাসিতা গুপ্ত সাম্রাজ্যকে একেবারে খাদের কিনারায় নিয়ে গিয়েছিল। উত্তরোত্তর হুণ আক্রমণে জেরবার গুপ্ত সাম্রাজ্য যে ধ্বংসের দিকে তা নিয়ে হুঁশ নেই কুমারগুপ্তের। যুবরাজ স্কন্ধগুপ্ত 'চোর রতন' নামে এক ব্রাত্য অপরাধীর চতুরতায় হুণ সংহারে সাফল্য লাভ করেন। অথচ এই যুবরাজকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন মহারাজের শ্বশুর মহেন্দ্রগুপ্ত। এক ব্রাত্য 'চোর রতন' যুবরাজ হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত মহেন্দ্রগুপ্ত তা আঁচ করেই সেই ষড়যন্ত্র বানচাল করে স্কন্ধগুপ্তের প্রাণরক্ষা করল কীভাবে তারই জীবন্ত উপাখ্যান এই উপন্যাসটি।

ভারতীয় ছাত্রসমাজে গণিতভীতি এক স্বাভাবিক মানসিকতা। অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ রায় একজন প্রখ্যাত পদার্থবিদ। তাঁর 'গাণিতিক বিস্ময় শ্রীনিবাস রামনুজন' রচনাটি গণিত-ভীতিপ্রবণ বাঙালী স্বস্তিকা পাঠককুলকে গণিতচর্চায় উৎসাহ দেবে। অসীম সংখ্যার ধ্যান-ধারণা ভারতীয় গণিতবিদদের ধ্যান-ধারণা সঞ্জাত তা মনে করিয়ে দেন কিশোর পড়ুয়াদের। শ্রী নিবাস রামানুজন কীভাবে জটিল পাটিগণিত অনায়াসে সমাধান করে সহপাঠীদের তাক লাগিয়ে দিতেন তারই এক সাবলীল রচনা এই প্রবন্ধটি।

যাই হোক, স্বস্তিকায় পুজোসংখ্যা সম্পর্কে আরও কিছু বলার থাকলেও স্থানের সংকুলনতার কথা ভেবে বক্তব্যকে সীমাবদ্ধ রেখে অলডাস হাক্সলির সেই বিখ্যাত মন্তব্যকে স্মরণে করা যায়। 'বোস ইনস্টিটিউট' রচনার সময় তিনি যা বলেছিলেন 'স্বস্তিকা' সম্পর্কে তা বলতে গেলে বোধ হয় একটুও অত্যুক্তি হবে না—'We Wander from marvel to marvel'। এই মন্তব্যটিই হবে এবার পুজো সংখ্যার যথার্থ আভরণ। তবে শেষে আরেকটা কথা না বললে অপূর্ণ থেকে যাবে তা হলো নতুন লেখকের সন্ধানে ব্রতী হোক 'স্বস্তিকা' এবার।

শব্দরূপ-৬৪৬ ঋতু ঘোষাল

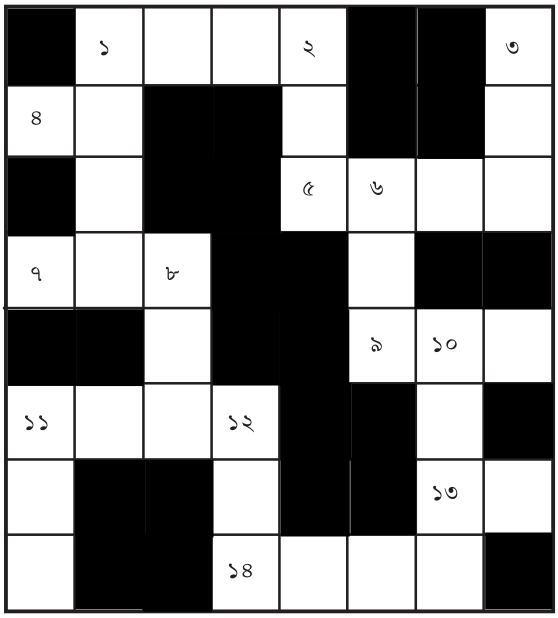

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. অন্য নামে ভীষ্ম, ৪. শ্যামা মায়ের পছন্দের লাল পুষ্প, ৫. ছেলেবেলায় ডাকনামে রামকৃষ্ণ দেব, ৭. প্রথম দুয়ে প্রথম সংখ্যা, দুই-তিনে বিশেষণে কী পরিমাণ, আসলে গৌতম মুনির পুত্র, ৯. দেবীর মহাশক্তি বিশেষ, শেষ দুয়ে কণ্ঠ, ১১. চাঁদ, প্রথম দুয়ে অমৃত, শেষ দুয়ে খাজনা, ১৩. তিথি নক্ষত্র শুভদিন তারিখ ইত্যাদি জ্ঞাপক পুস্তক বিশেষ, ১৪. 'আসে—তোমার প্রগাঢ় আলিঙ্গনে', শূন্যস্থানে নির্বাণ।

উপর-নীচ : ১. রাক্ষসরাজ রাবণের অন্যতম পুত্র, হনুমানের হস্তে নিহত, ২. বড় ও গভীর পুকুর, ৩. মহাভারতে নীলধ্বজ রাজা ও জনার পুত্র, শেষ দুয়ে বলবান ও সাহসী, ৬. দনুর পুত্র, আগাগোড়া বনাগ্নি, ৮. অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে দংশনকারী সাপবিশেষ, ১০. গণেশ, ১১. লাবণ্য, সৌন্দর্য, শেষ ঘরে জননী, ১২. রুপো।

সমাধান
শব্দরূপ-৬৪৩
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

					লা	দা	বি
	হা	ট	ক		য়ে		ন্দু
বি			ব	র্ত	ক		স
ধা	ন্যে	শ্ব	রী				রো
তা				ব	সু	দে	ব
পু		অ	ঘো	র			র
রু		ন		ট	ঙ্কা	র	
ষ	ড়	ঙ্গ					

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

■ ৬৪৬ সংখ্যার সমাধান আগামী ১০ ডিসেম্বর, ২০১২ সংখ্যায়

বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের উপস্থিতিতে আলোচনাসভা

বিষয় : সন্ত্রাসবাদের উৎস, ভণ্ড ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ভারতের ভবিষ্যত

বক্তা : ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, অমিতাভ ঘোষ, শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ

স্থান : ভারতসভা হল

৬২, বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট (বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট ও সেন্ট্রাল এভিন্যুর ক্রসিং)

তারিখ : ৮ ডিসেম্বর, ২০১২ (দ্বিতীয় শনিবার)
সময় : বিকেল ২-৩০ থেকে সন্ধ্যা ৭-০০
সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ।

With Best Compliments From :

Super Speed Carriers (P) Ltd.

2 No. Roopchand Ray Street

Kolkata - 700 007

।। চিত্রকথা ।। মহাভারত ।। ১৮

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

The Forest Friendly Company
100% NUKSAAN PROOF
HEAT SHIELD
Shields water & termite as well
DURO
DPS/SPIL/MAR12/024
Select DURO products come with a unique Heat shield – a classified heat resistant formula. The result of a dedicated R&D team & their well researched venture, DURO's Heat Shield technology ensures complete fire proof protection. Invest in them. Prevent your dreams from turning to ashes when there is still time.
FSC
www.fsc.org
FSC™ C106194
The mark of responsible forestry
E1
DURO™
BLOCK BOARD • PLYWOOD • VENEERS • DOORS
Sarda Plywood Industries Ltd. Website: www.sardaplywood.in | E-mail: info@sardaplywood.com | Toll Free Number: 1800-345-DURO(10am - 6pm Monday-Friday)
OUR BRANDS
Pumaply
ALL WEATHER PROOF PLYWOOD
Durobord
DUROFLEX
PREMIUM FLEXIBLE PLYWOOD
DURODOOR
FLUSH DOOR
DURO
NATURE SIGNATURE
PREMIUM VENEERS & PLYWOODS

দীপাবলীর শুভেচ্ছা সহ

সুনীতা ঝাওয়ার

কাউন্সিলার ও বিজেপি নেত্রী

৪২ নং ওয়ার্ড- কলকাতা পুরসভা

কিশান ঝাওয়ার

উত্তর-পশ্চিম কোলকাতা জেলা সভপতি
বিজেপি

With best Compliments from :

City Cement Private Limited

An ISO 9001 : 2000 certified com-pany

Kaduvita Road, Maheshpur,
P. O. - Kalyaneshwari-713 369
Dist. : Burdwan (W. B.)
Phone : 0341-2521407, 2523250,
Fax No. : 0341-252-4201

Manufacturer of Portland slag cement

With Best Compliments From :

ALLIANCE MILLS (LESSEES) LTD.

18, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001
Phone : 2243-6401 / 02

Quality manufacturers and leading exporters of hessian cloth and bags, sacking cloth and bags and twine

E-mail : alliance@cal12.vsnl.net.in
Fax : 91-33-22202260
GRAM : ALJUTLES

MILLS

Alliance Jute Mills

Jagatdal 24 Paraganas
Phone : 2581-2745 / 2746 (Bhatpara)

With Best Compliments From :-

Shree Enterprises (Coal Sales) Pvt. Ltd.

Coal Merchants & Commission Agents

32, Ezra Street,
Room No. 854,
Kolkata - 700 001
Phone (O) 2235-0277, 9934

With Best Compliments From :-

VIKRANT

Harry & Co. Trading (Kolhapur) Pvt. Ltd.

Gram : Lalchatri
2235-3641, 2235-6483

54, Ezra Street
Block D-2
Kolkata - 700 001

SARAF SILICATES

Nimakalali Road
P.O. Barakar
(Burdwan)

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
19 November - 2012

FOR INTERIORS THAT EVOKE ADMIRATION

For over two decades, Centuryply has been effortlessly redefining interiors into designer spaces with the most stunning range of products that reflect the very best of style, innovation and functionality.

CENTURYPLY
Quality that's a class apart!
Fortifying interiors with innovations like the first flexible ply, a 7 year termite-proof, pay back guarantee and many more…

CENTURYVENEERS
Exotic designs in wood!
Beautifying Interiors with an exclusive and wide range of Decorative veneers (only BWR available in India) & Senzura Styles, handpicked from around the world...

CENTURYLAMINATES
Style that stands out!
Trendsetting interiors with the widest range of laminates having myriad textures, stunning patterns and exquisite designs…

Also available:
CENTURYMDF
CENTURYPRELAM

CENTURYPLY®